



প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০০৮

Date of first edition publication: April, 2008

© সাইদ হোসেন কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

© Published by Sayed Hossain (writer)

Contact Address:

Sayed Hossain
Faculty of Management
Multimedia University
63100 Cyberjaya,
Malaysia
E-mail: sayed.hossain@yahoo.com

On line publication at URL: www.sayedhossain.com

©Sayed Hossain 2008

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে : সাইদ হোসেন

ISBN No. 978-983-43934-2-7

** The ISBN number is provided by the National Library of Malaysia.

© Ramader Deshe, A Bengali novel written by Sayed Hossain.

রামাদের দেশে

সাইদ হোসেন

Land of Smiles

সুবর্ণভূমি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট । বছর খানেক হলো এটা করা হয়েছে । দূর থেকে মনে হয় একটা নগরী জ্বলজ্বল করে জ্বলছে । এই এয়ারপোর্টের দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ এতটাই সু-প্রসস্থ যে, ঠিক কতটা জায়গা জুড়ে আছে, তা অনুমান করা যায় না । ব্যাংককের মূল শহর থেকে এক ঘন্টার ড্রাইভ । থাই সরকার এয়ারপোর্টে যাবার রাস্তাটা ফ্লাই-ওভার করে দিয়েছে যেন শহরের লোকজন অনায়েসে চলে আসতে পারে । অনেক দূর থেকেই চোখে পড়ে এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ার ।

একটু আগে মালয়শিয়া থেকে এসেছি থাইল্যান্ডে । সম্ভা উড়োজাহাজে চড়ে এসেছি । প্লেনের ভেতর খাবার কিনে খেতে হয় কিন্তু খাবারের দাম খুব কম । টিকেটের দাম এত স্বল্প যে, যে কেউ উড়োজাহাজে চড়তে পারে এখন ।

প্লেন থেকে নেমে হাঁটা দিয়েছি ইমিগ্রেশনের দিকে । লম্বা লাইন পড়েছে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ইমিগ্রেশনে পৌঁছানো গেলো ।

এক সুন্দরী ইমিগ্রেশন অফিসার এসে বললো,

সাইদ, তোমার পাসপোর্ট পড়া যাচ্ছে না । এক পাতার সাথে আরেক পাতা লেপ্টে আছে ।

আমি পাসপোর্ট খুলে দেখলাম, সত্যি তাই । ছবি সম্বলিত পাতাটা লেগে আছে আরেক পাতার সাথে ।

সম্ভা কাগজ আর প্রযুক্তির জন্য এই হাল ।

আমি বললাম, তাহলে এখন কি করবে ?

তোমার কাছে Invitation letter আছে ?

আমি বাড়িয়ে দিলাম ।

মেয়েটা পড়লো অনেকক্ষণ ধরে তারপর বললো, তুমি Chulalongkorn ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে এসেছো ?

আমি মাথা নেড়ে সাই দিলাম ।

মেয়েটা বললো,

শিক্ষকদের সম্মান করতে প্রতিটি থাই নাগরিক পছন্দ করে। আমি নিজেও করি। তোমাকে ভিসা দিয়ে দিচ্ছি তবে তোমার পাসপোর্ট চেক করে ফেলো। না হলে অন্য কোথাও বিপদে পড়বে। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

কাস্টম, চেকিং, মালপত্র ছাড়াতে ছাড়াতে এক ঘন্টা লেগে গেলো তারপর Exit এর দিকে হাঁটা দিয়েছি। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে দেখলাম বুর বুরে বৃষ্টি। মনটা ভরে গেলো বৃষ্টির গন্ধে। কি সুন্দর আকাশ বেয়ে বৃষ্টি নেমে আসছে তারপরে বুর বুর করে ভাসিয়ে ফিরছে এয়ারপোর্টের রানওয়ে, বেলকনি আর সামনে পড়ে থাকা খোলা যায়গা। রবীন্দ্রনাথের কথা এসে মনে ভর করলো।

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা

কূলে একা বসে আছি নাহি ভরষা

তখন কেবল সকালের আলো ফুটতে শুরু করেছে। বৃষ্টির কারণে আকাশ ভার হয়ে আছে। ঘড়িতে সকাল আটটার ঘন্টা দিলো। আমাকে যে লোকটার নিতে আসার কথা ছিলো, সে এখনো আসেনি। বাইরে এসে কাউকে পেলাম না। অনেকক্ষণ দাড়িয়ে রইলাম Arrival এর মাথায় তারপর ভেতরে চলে এলাম। ওর কাছে আমার নাম্বার দেয়া আছে। প্রয়োজনে যোগাযোগ করবে।

বলতে বলতে হ্যান্ডফোন বেজে উঠলো। একটা ভরাট কণ্ঠ ভেসে এলো,

স্যার, মাফ করবেন। রাস্তায় চাকা ফেটে গিয়েছিল তাই এলোমেলো হয়ে গেছে সব টাইমটেবল। এক ঘন্টার মধ্যে আসছি।

আমি বললাম, ঠিক আছে। আমি এরাইভেলে অপেক্ষা করবো।

ফোন রেখে দিলাম। সারারাত এয়ারপোর্টে এয়ারকন্ডিশন চলেছে তার সাথে সকালের বৃষ্টি যোগ হয়ে তাপমাত্রা ক্রমেই নিচে নেমে এলো। আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। ব্যাগ থেকে সোয়েটার বের করে জড়িয়ে বসেছি। একটু গরম কফি হলে ভালো হতো।

হাঁটতে হাঁটতে ভেতরে এলাম । একজন থাই মহিলা চা, কফি বিক্রি করছে । বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে বলে মনে হয় কিন্তু কেমন শুকনো । থাইরা অবশ্য গড়ে সবাই শুকনো । খুব মোটা মানুষ চোখে পড়ে না এ দেশে তবে কার যে কত বয়স, সেটা বলতে খুব মুশকিলে পড়তে হয় ।

রেস্তুরায় ঢুকতে দেখে মহিলা বললো, চা, কফি কিছু খাবে ?

দিতে পারো । কফিতে চিনি কম দেবে ।

ঠিক আছে, এই বলে মহিলা বিনয়ের হাসি হাসলো ।

প্লেন থেকে নেমে দেখেছি বড় বড় করে লেখা, Thailand - The Land of Smiles । প্রথম প্রথম কাথাটার অর্থ ধরতে পারিনি পরে জানতে পেরেছি এর কথা । থাই সমাজের কথা হলো, আগামী কালের কথা ভেবে আজকে মাথা খারাপ করো না । যা হবার হবে, এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই । মনকে সব সময় হাসিখুশি রাখবার চেষ্টা করবে । তখন আমার মনে হয়েছিলো, তাহলে এদেশের নাম থাইল্যান্ড না রেখে হাসি-খুশির দেশ রাখলেই পারতো ?

কফি চলে এলো । মহিলা বললো, একদম চিনি দেইনি । এই যে চিনির পোটলা, তুমি পছন্দ মতন ঢেলে নাও ।

আমি বললাম, এটাই ভালো করেছো ।

হ্যাঁ, আমরা তাই করি । চিনি, দুধ সব কফির সাথে জুড়ে দেই, যার যার মতন নিয়ে নেবে ।

ভালো ।

তুমি কি এখনি নামলে ?

এক ঘন্টা হলো ।

কোথায় যাবে ?

সুকুমভিট রোডে ।

সাথে গাড়ি আছে ?

হুঁ । গাড়ি আসছে আমাকে নিতে ।

তাহলে তো ভালো । ডিমের মামলেট করে দেবো ? আর টোস্টেড ব্রেড ?

না লাগবে না । তোমাকে ধন্যবাদ ।

ভালো করে খেয়াল করে দেখলাম ক্ষিদেয় পেট চো চো করছে । তার উপরে গাড়ি আসতে আরো এক ঘন্টা ।

কথা ঘুরিয়ে বললাম, দিতে পারো, ডিমের মামলেট আর টোস্টেড ব্রেড ।

ঠিক আছে, একটু বসো । বানিয়ে আনছি ।

দশ মিনিটের মধ্যে এলো ডিমের মামলেট আর টোস্টেড ব্রেড । কি সুন্দর মোলায়েম করে রুটি ভেজেছে ওরা । ডিমের মামলেট থেকে ধূয়া উড়ছে ।

আমি দেরি না করে খেতে বসে গেলাম ।

আর কিছু লাগবে ?

না । ধন্যবাদ ।

একটু আমের জুস দেবো ?

না এখন আর খাই না । তারপর বললাম, কখন বৃষ্টি নেমেছে ?

আজ দুদিন হলো । থামবার কোন লক্ষণ নেই । আকাশ একটু পরিষ্কার হয়ে আবার বুর বুর করে নেমে আসে ।

- তাহলে তো খুব মজা । ঠান্ডায় ঠান্ডায় কাজ করতে পারো ।

মহিলা বললো,

এয়ারপোর্টের বাইরে মজা । বাসা-বাড়িতে বেশ লাগে । রাতে ভালো ঘুম হয় কিন্তু এয়ারপোর্টে ভালো লাগে না কারণ এমনিতেই এয়ারপোর্ট হিম হয়ে থাকে । তার উপর বৃষ্টি এসে কাঁপন ধরিয়ে দেয় । দেখ না কত ভারী জামা কাপড় পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি ।

তাহলে তো বিপদে আছো ?

মহিলা হাসলো । কিছু বললো না ।

আমি ডিমের মামলেটে কামড় বসিয়ে দিয়েছি । পুরো কাচের জানালা গলিয়ে দেখলাম বুর-বুরে বৃষ্টি । আমাদের অঞ্চলে এই বৃষ্টিকে কাইতান বলে । একটানা সাতদিন চলে তারপর একদিন বিরতি দিয়ে আবার নেমে আসে কাইতান ।

ছোটবেলার কথা মনে পড়লো । আমরা তখন ঢাকার অভয় দাস লেনে থাকতাম । বাড়ির পাশেই কামরুল্লাহ সাহু, ওখানে আমার বোনেরা পড়তো । যেদিন খুব ভ্যাপসা গরম পড়তো, বুঝতাম রাতে বৃষ্টি নামবে । আমাদের ধারণাটাই ঠিক হতো । স্কুলে পড়তাম বলে মা তাড়াতাড়ি শুইয়ে দিতেন । অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যেত বৃষ্টির শব্দে । সড়সড় করে বৃষ্টি নেমে আসছে কাচের জানালা বেয়ে । তখন বিছানা ছেড়ে গিয়ে বসতাম জানালার পাশে ।

মা এসে বলতেন, বাবু । ঘুমাবি না ?

- এই তো যাচ্ছি ।

মা এসে বসতেন পাশে । মা আর আমি মিলে বৃষ্টি পড়া দেখতাম ।

মা বলতো, বাবু, তোর বুঝি বৃষ্টি খুব ভালো লাগে ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিতাম ।

মা বলতো,

আমরা ছোটকালে অনেক ভিজছি । তোদের নানি বৃষ্টিতে ভিজতে দিতো না কারণ ভিজলে ভিজলে জ্বর বাধাতাম । তাই লুকিয়ে লুকিয়ে ভিজতে হতো ।

আমি বললাম, এখন আর বৃষ্টিতে ভেজো না ?

মা হাসলেন, কিছু বললেন না ।

বৃষ্টির কোন খানটা তোর ভালো লাগে, বাবু ?

বৃষ্টির গায়ে রাস্তার যে আলো এসে পড়েছে, সেইটে সবচেয়ে সুন্দর ।

মা বললেন, কই দেখি ?

আমি মাকে দেখিয়ে দিলাম ।

বাবু, তুই বড় হয়ে কি হবি ?

আমি হেসে বললাম, কি হলে তুমি খুশি ?

শিক্ষক । বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ।

ঠিক আছে, তাই হবো ।

খুশি হয়ে যেতেন আমাদের মা । মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন, চল, এইবার শুবি ।

ঠিক আছে চলো, এই বলে জানালা ছেড়ে বিছানায় উঠে আসতাম । পেছনে পড়ে থাকতো শুধুই বৃষ্টি, সাদা ফোটার বৃষ্টি ।

সুকুমভিট রোড

হোটেলের সামনে খোলা জায়গা, যেমনি প্রশস্ত তেমনি চওড়া । পুরো জায়গাটা এয়ারকুলারে মুড়ানো, সেখানে সকালের নাস্তা খেতে বসেছি । সুকুমভিট রোডে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচতারা হোটেলের আস্তানা গেড়েছি মাস তিনেকের জন্য । ব্যংকক শহরের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে এই সুকুমভিট রোড, যে কেউ দেখিয়ে দিতে পারবে ।

ব্রেকফাস্টের জায়গাটা অনেক প্রশস্ত । অনেকগুলো টেবিল পাতা আছে সেখানে । কি সুন্দর লাল-নীল কাপড়ে টেবিলগুলো মুড়ানো । টেবিলের খাঁজে খাঁজে গাছ বুন দেয়া আছে । সেই গাছে আবার সাদা ফুল । এই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে কিভাবে গাছ গুলো ফুলে-ফুলে ভরে থাকে, তা বোধ গম্য হলো না । পরে জানতে পেরেছি সে কথা ।

হোটেল ওয়ালাদের কাছে সব সময়ে গাছগুলোর দুই সেট থাকে । এক সেট ওরা হোটেলের ছাদে ফেলে রাখে । প্রকৃতির হাওয়ায় বড় হয় ওগুলো । অন্য সেটটা হোটেলের কোনা-কান্ধিতে ছড়িয়ে দেয়া হয় । হোটেলের কোনা-কান্ধিতে রাখা গাছগুলো যখন ঝিমিয়ে যায়, তখন ওগুলো ছাদে নিয়ে যাওয়া হয় । এ সময় যে সেটটা তরতাজা হয়ে আছে, সেটা হোটেলের কোনা কান্ধিতে বসিয়ে দেয়া হয় । এভাবে অদলবদল করে হোটেলের ভেতরে বাগান তৈরি হয়েছে ।

সাদিকা । মাই নেম ইজ শিমলা, শিমলা আচার্য । আমি হোটেলের Executive Manager, এই বলে একটা মেয়ে দুই হাত এক কোরে নমস্কার করলো । নমস্কার করতে গিয়ে মেয়েটা ঝুঁকে পড়েছে । তারপর বললো, তোমার তো কোন অসুবিধে হচ্ছে না এখানে ?

আমি বললাম, না । আমি তো বেশ আছি, এই বলে দেখলাম একটা থাই মেয়ে । সাদা রঙের জামা আর গাউন পড়েছে । সাধারণ থাইদের চেয়ে একটু উঁচু । বয়স কত হবে ? এখনো ত্রিশ পেরোয়নি । আমার চেয়ে দুই এক বছরের ছোট হবে হয়তো । বাঙ্গালী স্টাইলে চুল বাঁধা, সারা মুখে পিনকের ছড়াছড়ি । কানের পাশটা লালচে হয়ে উঠেছে ।

আমি বললাম, কি দাঁড়িয়ে রইলে যে ? বসে পড়ো, এক সাথে Breakfast করি ।

ধন্যবাদ, এই বলে শিমলা কথা না বাড়িয়ে বসে পড়লো ।

আমি বললাম, সাদিকা মানে কি ?

সাদিকা মানে স্বাগতম । You are welcome । থাইরা সাধারণত Good Morning বা Good Evening বলতে অভ্যস্ত নয় । সাদিকা দিয়ে সবাইকে স্বাগত জানায় ।

শিমলাকে আমার পাশে বসতে দেখে হোটেলের কয়েকজন এগিয়ে এলো । তারা ভেবেছে আমি কোন VIP আর তা না হলে পঁচতারা হোটেলের Executive Manager খেতে বসে না ।

শিমলা ইশারা ইংগিত করে বোঝালো তার কিছু লাগবে না তারপরেও একজন দাঁড়িয়ে রইলো ।

শিমলা বললো, তুমি তো বাংলাদেশ থেকে এসেছো ?

কিভাবে বুঝলে ?

Boarding card এ তোমার নাম আর প্রফেশন দেখেছি, সাইদ হোসেন, ইকোনোমিস্ট, বাংলাদেশী ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

Boarding card না দেখেও বলে দেয়া যায় তুমি বাংলাদেশী ।

কিভাবে ?

তোমাদের চোখগুলো ইয়া বড় বড় আর নাক-কান খাড়া । চামড়ায় টান টান ভাব ।

তুমি তো দেখছি খুব ভাল চেনো আমাদের ?

শিমলা হেসে বললো,

হ্যাঁ চিনি কারণ আমার সেরা বন্ধুটি তোমাদের দেশের । নাম হাসিব আখতার । এক সাথে Thammasat University তে পড়েছি আমরা । হাসিবের সাথে তোমার অনেক মিল তাই কথা বলতে এলাম । কিছু যদি মনে না করো এখানে কোথায় এসেছো ?

আমি বললাম, মনে করবো কেনো ? আমি মালয়শিয়াতে চাকরি করি । ওখানকার এক ইউনিভার্সিটিতে পড়াই । এখানে এসেছি তিন মাসের জন্য পড়াতে ।

কোথায় পড়াবে ?

Chulalongkorn University তে ।

Chulalongkorn University এখান থেকে কাছে । তাহলে আমাদের এখানে থাকছো তিন মাস ?

হ্যাঁ, বলে আমি মাথা নাড়লাম ।

ভালই হলো । তোমার সাথে মাঝে-মাঝে চা খাওয়া যাবে, এই বলে সুন্দর করে চা বানালো শিমলা । ক চামচ চিনি দেবো, স্যার ?

আমি বললাম, আমাকে স্যার বললে খুব অস্বস্তি বোধ করি । আমার নাম ধরে ডাকলে খুশি হবো ।

শিমলা জিভ কেটে বললো, Boarder দের স্যার বলাটা আমাদের strictly maintain করতে হয় ।

উপর থেকে বলা আছে ।

কিন্তু কোন Boarder যদি comfortable বোধ না করে সে ক্ষেত্রে কি করবে ?

শিমলা চুপ হয়ে গেলো । তারপর আশ্বে আশ্বে বললো, সে ক্ষেত্রে কি করবো ভেবে বলতে হবে ।

Yes, সেটাই ভাবো, আমি মাথা নেড়ে বিনয়ের সাথে বললাম ।

চা বানাতে বানাতে শিমলা বললো, ক চামচ চিনি দেবো ?

এক চামচ ।

একটু দুধ দেই ?

না । এতেই চলবে । তুমি খাবে না ? আমি জানতে চাইলাম ।

না । আমি চা খাই না ।

তাহলে একটু জুস নাও ? আমি তাড়া দিয়ে বললাম ।

তুমি আগে নাও তারপর আমি নিচ্ছি । বসে বসে তোমার চা খাওয়া দেখি ।

আমার চা খাওয়া দেখে কি করবে ?

দেখতে ভালো লাগবে তাই দেখবো ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

শিমলা বললো, আগে কখনো থাইল্যান্ড এসেছো ?

হ্যাঁ । ঘন্টা খানেকের Transit ছিল, তখন য়েটুকু দেখেছি ।

তাহলে তো দেখা হয়নি । ঘন্টা খানেকে আর কতটুকু দেখবে ? এ যে বিরাট দেশ ।

আমি হেসে বললাম, এবার সব দেখে ফেলবো ।

শিমলা বললো,

বাইরে থেকে অনেকে অনেক কিছু বললেও এদেশ কিন্তু এখনো কৃষির উপর দাঁড়িয়ে । কৃষি এদেশের প্রধান চালিকা শক্তি তবে শিল্পের প্রসার হচ্ছে ব্যাপক পরিসরে ।

আমি বললাম, এদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ?

শিমলা বলতে লাগলো,

দেশের সকল কেন্দ্র বিন্দুতে আছে এদেশের রাজা । যদিও রাজার সাংবিধানিক ক্ষমতা নেই বললেই চলে কিন্তু রাজাকে সবাই মেনে চলে । রাজাই হলো এদেশের ঐক্যের প্রতীক । জাতীয় পর্যায়ে কোন সমস্যা হলে রাজার মধ্যস্থতায় তা সমাধানের চেষ্টা চলে । এ দেশের রাজারা রামা নামে পরিচিত ।

আমি বললাম, যেমন, মিশরের রাজা মাত্রই ফারাও, রাশিয়ার রাজা মাত্রই জার, সে রকম কিছু ?

ঠিক তাই, এই বলে শিমলা হেসে দিলো । থাই রাজা মাত্রই রামা । বর্তমানে রামা নাইন তখনে আসীন, সম্ভবত রামা নাইন বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম সময়ের রাজা ।

আমি বললাম, রাজার বাড়ি কি কাছেই ?

খুব কাছে । তোমাকে নিয়ে যাবো একদিন রাজার বাড়িতে । রাজাকে না দেখাতে পারি, ওর Palace টা দেখাতে পারবো তবে টেলিভিশনে হামেশাই রাজাকে দেখবে ।

হ্যাঁ দেখেছি গত রাতে । আজ ভোরেও দেখলাম । সকালটা শুরু হলো রাজা কে দিয়ে ।

তাহলে তোমার দিন ভালো যাবে অন্তত আমার দিনটা ভালো যায় রাজা কে দেখে যাত্রা করলে ।

আমি হেসে বললাম, তোমার যদি ভাল যায়, আমারো ভাল যাবে ।

শিমলা বললো, তোমাকে ক স্নাইস ব্রেড দেবো ?

আমি নিশ্ছি, এই বলে উঠে দাঁড়লাম ।

তুমি বসো । আমি আনছি ।

আমাকে জোড় করে বসিয়ে রুটি ছেকে আনলো শিমলা । একটু দূরে যে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিলো তাকে বললো দুই কাপ কফি দিতে ।

দেখতে দেখতে কফি এলো ।

শিমলা বললো, জেলি দেবো ?

দাও ।

লাল সবুজ জেলি চলে এলো টেবিলে ।

নাও । যেটা ভালো লাগবে তুলে নাও ।

আমি সবুজ জেলি মাখাতে লাগলাম কড় কড়ে ব্রেডের গায়ে । আঙুনে পুড়ে ব্রেডগুলো কেমন লালচে রং ধারণ করেছে ।

শিমলা বললো, কবে থেকে তোমার পড়ানো শুরু হচ্ছে ?

এই দুই দিন রেস্ট তারপর শুরু । সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস, বাকী চারদিন নিজের পড়াশুনা ।

ওরা খুব সুন্দর রুম দিয়েছে । চেয়ার, টেবিল, কমপিউটার সব আছে ।

যাতায়াত করবে কিভাবে ?

প্রতিদিন গাড়ি আসবে সকাল নটায় আবার বিকেলে পৌঁছে দেবে ।

শিমলা বললো, তাহলে তো খুব ভাল । তোমার দিন ভালো যাবে ।

বলতে পারো । কোন অসুবিধা দেখছি না ।

তুমি কি নিয়ে কাজ করো সাইদ ?

টাকার গতিবিধি নিয়ে কাজ করি । ঠিক কতটা টাকা বাজারে ছাড়তে হবে, তার একটা যুৎসই হিসাব বের করবার চেষ্টা করি । টাকা বেশি বা কম ছাড়লে চলবে না, ঠিক যুৎস পরিমাণে ছাড়তে হবে ।

তুমি তো অর্থনীতিবিদ । তোমরা বাংলাদেশীরা অর্থনীতিতে খুব ভালো, তাই না ?

কি জানি । তোমার কি মনে হয় ?

আমার মনে হয় বলেই তো বললাম । তোমাদের অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ইউনুস তো নবেল জিতে নিলেন ?

হুঁ ।

তুমি কবে নবেল পাচ্ছে ?

আমি হেসে বললাম, তোমার কি মনে হয় ?

শিমলা হেসে বললো, তোমরা তো সাহিত্যেও খুব ভালো ।

হুঁ । বলতে পারো ।

শিমলা বলতে লাগলো,

তোমাদের দেশের জীবনানন্দ দাশ আমার ফেব্রুয়ারি । আমি প্রায়ই পড়ি ওর লেখা । আমার লাইব্রেরিতে জীবনানন্দ দাশের সব কালেকশন পাবে, সেই সাথে ওর ছবি । যেদিন থেকে জীবনানন্দ পড়তে শুরু করি, তখন থেকে তোমাদের দেশ সম্পর্কে আমার আগ্রহ । তোমাদের দেশের কোন মানুষ পেলো কথা বলবার চেষ্টা করি ।

আমি বললাম, জীবনানন্দের সন্ধান কিভাবে পেলো ?

আমি Thammasat University তে সাহিত্য আর দর্শন নিয়ে পড়েছি । সেই সুবাদে জীবনানন্দের খবর পাই ।

আমি বললাম, তাহলে এই পাঁচতারা হোটেলের চাকরি পেলো কিভাবে ?

Thammasat University তে Bachelor করবার পর অস্ট্রেলিয়াতে MBA করেছি ।

আমার MBA তে Major ছিলো Accounting, সেই সুবাদে হোটেলের চাকরিটা পেয়ে যাই ।

আমি বললাম, তাহলে তো তুমি সাহিত্য, দর্শন, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই জানো ?

শিমলা বললো,

তা ঠিক না । কিছু কিছু জানি, বাকীটা তোমার কাছে শিখবো । তুমি তো অর্থনীতিবিদ, Monetary Economist । তোমার কাছে ঢের ঢের অর্থনীতির খবর পাওয়া যাবে ।

আমি বললাম, তাহলে তোমার চর্চা কোন দিকে ? সাহিত্য না অর্থনীতি ?

দুটোই । যখন যেটাতে সুযোগ পাই । তুমি এসব সাহিত্য চর্চা করো না ?

আমি বললাম,

আমাকে হাজার গুতোলে এক লাইন কবিতা আসবে না, তবে কেউ লিখলে পড়তে বসে যাই । তোমার বন্ধু হাসিবের কি এসব বাতিক ছিলো ?

সে তোমার মতনি, নিজে কিছু লিখবে না তবে কোন লেখা পেলো সেটা নিয়ে বসে যেতো । এই যে বসতো, না শেষ করে উঠতো না । তোমাদের দেশের ছেলেরা খুব ভালো, তাই না সাইদ ?

আমি হেসে বললাম, এখন কোথায় আছে হাসিব ?

Dallas । সুদূর আমেরিকাতে । চাকরি করে ভাল কোম্পানীতে । বিয়ে করেছে পছন্দের মেয়েকে । এক ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে সাজিয়েছে সুখের সংসার ।

তোমার সাথে যোগাযোগ আছে ?

আছে, প্রায় E-mail করে । বউ বাচ্চা পেয়ে বন্ধুদের ভুলে যায়নি ।

তাই, বলে আমি চুপ করে গেলাম ।

দুজনে নীরবে খেয়ে চলেছি । শিমলা পারতপক্ষে কিছুই নেয় নি । একটি রুটির মাথা নিয়ে সেই সকাল থেকে নাড়াচাড়া করছে । মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে । এই নীরবতা ভেঙে আমি বললাম, জীবনানন্দ দাশের কোন কোন কবিতা পড়েছো ?

বলতে পারো সবি । বনলতা সেন, রূপসী বাংলা, ধুসর পান্ডুলিপি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছি । এর মধ্যে ভালো লেগেছে আকাশলীনা, বনলতা সেন, হাওয়ার রাত, কুড়ি বছর পরে কবিতাগুলো ।

বলতে পারবে দুই এক লাইন ?

ঠিক আছে, এই বলে শিমলা বলতে শুরু করলো,

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি,
বলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে ;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা ;
নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে ;

কেমন লাগলো সাহিদ ?

দারুণ । খুব সুন্দর । এইটে কোন কাব্যগ্রন্থের ? আমি জানতে চাইলাম ।

সাতটি তারার তিমির কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা । কবিতার নাম আকাশলীনা, এইটে লিখে জীবনানন্দ দাশ নাম কুড়িয়ে নেন ।

আমি বললাম,

আমার মনে পড়েছে । আমার এক বন্ধু সব সময় আবৃত্তি করতো এই কবিতাটা আর বিড় বিড় করে কি যেন বলতো । যাইহোক, আরো একটা শোনাও ।

ঠিক আছে । এবার বনলতা সেন থেকে দুই এক লাইন বলছি ।

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবির পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিশ্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূরে অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদন্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন ।

আমি বললাম,

এ যে দারুণ ব্যাপার । আজ সকালটাই শুরু হলো কবিতা দিয়ে । এই বিদেশে বিড়িয়ে
বাংলাদেশের কবিতা শুনবো, ভাবাই যায় না । আশা করছি কবিতায় কবিতায় ভরে থাকবে বাকী
দিনগুলো ।

শিমলা বললো, তুমি কি এসব পড়েছো ?

কিছু কিছু পড়েছি । তোমার মতন মুখস্থ বলতে পারবো না । তোমার আবৃত্তি শুনে মনে
পড়ছে ।

শিমলা বলতে শুরু করলো,

জীবনানন্দ দাশ পড়বার পর থেকে তোমাদের শিল্প, সাহিত্য আর দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ি ।
ধীরে ধীরে সন্ধান পাই রবীন্দ্রনাথের । তারপর পর্যায়ক্রমে নজরুল, সুনীল, বুদ্ধদেবের কথা জানতে পারি
। সেই থেকে ঠিক করেছি তোমাদের দেশের কোন মানুষ পেলে আলাপ করবো, পরিচিতি হবো ।

তাহলে কি সেই সূত্র ধরে হাসিবের সাথে পরিচয় ?

ঠিক তাই, এই বলে শিমলা হেসে দিল । তোমাদের দেশের সেরা ছাত্র হাসিব আখতার
Thammasat University তে পড়তে এলো, এই বলে আস্ত একটা ব্রেড তুলে দিল আমার পাতে
। তারপর বলতে লাগলো, একদিন ইউনিভার্সিটি ক্যাফেটেরিয়াতে বসে আছি । দেখলাম একটা ছেলে
আমার পাশ দিয়ে যায় ।

আমার এক বন্ধু বললো, এই ছেলেটা কিন্তু বাংলাদেশ থেকে এসেছে । তোর তো আবার বাংলাদেশ
প্ৰীতি আছে, এই বলে সবাই হেসে উঠলো ।

আমি সেদিকে তাকালাম না, দেখলাম হাসিব গিয়ে বারান্দায় বসেছে । আমি গিয়ে হাজির হলাম ।

তুমি বাংলাদেশ থেকে এসেছো ?

ছেলেটা হেসে দিলো । হ্যাঁ কেন ?

তোমার সাথে কথা বলতে পারি ?

হ্যাঁ পারো । এভাবে হাসিবের সাথে পরিচয় ।

আমি বললাম, তাহলে তো তুমি হাসিবকে চেনো, জীবনানন্দ দাশকে চেনো, সেই সুবাদে বাংলাদেশের অনেক কিছু ।

হ্যাঁ বলতে পারো । আমি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে একটা ওয়েবসাইট maintain করি । তার লেখা, তার ছবি দিয়ে ভরে ফেলেছি ওয়েবসাইট ।

এ যে দারুণ ব্যাপার । তাহলে তো যে কেউ জীবনানন্দকে জানতে পারবে, জানতে পারবে ওর সব কর্মকাণ্ড ।

সে জন্মই তো করেছি ।

তোমার web address টা জানতে পারি ?

এই নাও, এই বলে শিমলা web address টা লিখে দিলো । তারপর বললো,

মজার ব্যাপার কি জানো এই ওয়েবে দেখবে আমি জীবনানন্দ দাশের পাশে দাঁড়িয়ে আছি ।

দুজন হাসছি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে । আসলে এইটে ক্যামেরার কারসাজি ।

আমি বললাম, অনেকেই করে এসব । তাতে দোষের কিছু দেখছি না । ফ্যানরা করবে এটাই স্বাভাবিক । একবার ঘুরে যাও না বাংলাদেশে ?

নিশ্চয় যাবো । বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতে গিয়েছি ছোটকালে ।

কোথায় গিয়েছিলে ? আমি জানতে চাইলাম ।

শিমলা । হিমাচল প্রদেশের রাজধানী, উঁচু পাহাড়, বরফ আর অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ী জনপদ ।

কেনো গিয়েছিলে ?

শিমলা বলতে লাগলো,

আমার বাবা শিমলায় কাটিয়েছেন অনেক বছর । পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার । বাবার কোম্পানি

একটা শাখা খুললো শিমলাতে । বাবার পোস্টিং পড়লো ওখানে । সেই সুবাদে শিমলা গিয়েছিলাম ।

এক বছর থেকেছি । ক্লাস সিক্সের পড়াটা ওখানকার এক স্কুলে সারি তারপর ফিরে আসি ব্যাংককে ।

বাবা আসা যাওয়ার মধ্যে থাকতেন ।

তোমার শিমলা নাম কি সেখান থেকেই ?

ঠিক তাই, এই বলে শিমলা হেসে দিলো । আমার যখন জন্ম হয়, তখন বাবা শিমলাতে । টেলিফোন করে মা জানালো আমার জন্মের কথা । বাবা আমার নাম রাখলেন শিমলা, শিমলা আচার্য । সেই থেকে শিমলা ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম । কিছু বললাম না ।

তোমার কখনো শিমলা যাওয়া পড়েছে ?

আমি মাথা নেড়ে না বললাম ।

ভুল করবে যদি না যাও ।

কেন ?

শিমলা বললো,

এ যে নুতন এক পৃথিবী । বিলিয়ন ডলার খরচ করে মানুষ মহাশূন্যে যাচ্ছে নুতন পৃথিবীর খোঁজে আর তুমি ঘরে বসেই নুতন পৃথিবী দেখছো ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

শিমলা বলতে লাগলো, এক বছর ছিলাম । কি যে ভালো লেগেছে সেই দিন গুলো ।

শিমলা নিয়ে কিছু বলবে ?

শিমলা বলতে শুরু করলো,

পুরো শিমলা পাহাড়ের খাঁজে বানানো । সেই পাহাড়ের খাঁজে মানুষেরা হরেক রকমের ঘর-বাড়ি বানিয়েছে । অফিস থেকে বাবা দোতলা বাড়ি পেয়েছিলেন । আমি বেছে বেছে দক্ষিণের ঘরটা নিলাম । সেই ঘর লাগোয়া বারান্দা, সেই বারান্দা বরাবর নেমে গেছে পাহাড়ী খাদ । সেই খাদ ভরপুর হয়ে ছিল হাজারো গাছ গাছালিতে ।

একটু থেমে শিমলা আবার বলতে শুরু করলো,

সারা বছর জুড়ে ঠান্ডা বয় শিমলাতে । আমরা মাঝারি ভারী কাপড় পড়ে ঘুরে বেড়াইতাম তবে শিতকালে হাড় কাঁপানো শীত । তখন ভারী কাপড় না চাপালেই না । এক দিনের কথা মনে পড়ে, শুনবে ?

প্লিজ বলো ।

শিমলা বলতে লাগলো,

একদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেলো তারপর হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে বসেছি । তখনো অন্ধকার কাটেনি । বারান্দায় বসতেই হাড় কাঁপানো শীত এসে বিধতে লাগলো । মোটা সোয়েটার আর বিছনার ব্ল্যাংকেট চাপিয়ে নিয়েছি । দৃষ্টি চলে গেলো সামনে পরে থাকা বিস্তৃত পাহাড়ী অরণ্যে । তাকিয়ে দেখলাম দূরে, অনেক দূরে পাহাড়ী চূড়ায় বরফ জমে আছে । মনে হলো সাদা মুকুট পড়ে বসে আছে পাহাড়গুলো । কিছুক্ষণ যেতেই সাদা মুকুট থেকে আলো ছড়াতে লাগলো । বুঝলাম সূর্য মাঝ পাহাড়ী চূড়ায় উঠে আসছে । এক সময় দেখলাম সারাটা পাহাড় সোনালী আলোয় ভরে উঠেছে । ধীরে ধীরে তার আভা ছড়িয়ে পড়লো বীষ্টির্ণ পাহাড়ী অরণ্যে, এই বলে শিমলা চুপ হয়ে গেলো ।

কেমন লাগলো সাইদ ?

এ যে দারুণ ব্যাপার । এ না দেখলেই না ।

শিমলা হেসে দিলো ।

আমি বললাম, এই শিমলা নামটা কোথেকে এলো ?

দেবী শ্যামলার মন্দির আছে শিমলায় । সেই শ্যামলা দেবী থেকে এই শিমলার নামকরণ ।

এই শ্যামলা দেবী কি কালি দেবীর আরেক রূপ ?

ঠিক তাই, এই বলে শিমলা হেসে দিলো । তুমি মনে হয় ভারতীয়দের খুব চেনো ?

আমি বললাম,

আমাদের তিনপাশেই যে ভারত । ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য আর সংস্কৃতি আমাদের ব্যাপক প্রভাবিত করে । বাংলা সাহিত্যের বড় বড় দিকপাল পাবে এই ভারতবর্ষে । কত যে ধর্ম, বর্ণ, জাতি ছড়িয়ে আছে এদেশে, তার ইয়ান্তা নেই । অনেকে বলে, প্রতি বিশ কিলোমিটার পর পর নূতন নূতন মানুষ, বিশ্বাস ও আচার-আচরণ চোখে পড়বে । দেব-দেবী, প্রেরিত পুরুষ, মহাপুরুষ আর অবতার দিয়ে ঠাসা এই ভারতবর্ষ ।

শিমলা বললো, তোমার কখনো ভারতে যাওয়া পড়েছে ?

আমি বললাম, ছোটকালে গিয়েছিলাম বাবা-মার সাথে । এর পর আর যাওয়া হয়নি । তবে শিমলার কথা শুনে লোভ হচ্ছে ।

সুযোগ পেলে যেও । শিমলা অবশ্যই রাখবে লিস্টে ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম, বললাম, আর কি কি দেখলে শিমলায় ?

রাতের শিমলা অন্য রকম । শীতকাল এলে বরফ পড়তে শুরু করে । সেই বরফে ঢেকে যায় পাহাড়ী উপত্যকা ।

তাহলে তো পূর্ণিমা রাতে দারুণ লাগবে ?

সে কথাই তো বলতে চাচ্ছি, আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শিমলা বলতে শুরু করলো,

দিন পেরিয়ে রাত এলো । চন্দ্র মামা উঠে এলেন পাহাড়ী খাঁজে তারপর আলো ছড়াতে লাগলেন । সেই আলো গিয়ে পড়লো বরফে ঢাকা বিস্তীর্ণ উপত্যকায় । তাকিয়ে দেখলাম আমার বারান্দা, বাড়ির আঙিনা আর সদরের রাস্তা সাদায় সাদায় থিকথিক করছে । এ এক সাদা আলোর দেশ ।

আমি বললাম, এখনো কি মনে পড়ে সেই সাদা আলো দেশের কথা ?

হু মনে পড়ে । এ যে ভুলবার না । মাঝে মাঝে অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায় । তখন আর ঘুম আসে না । বারান্দায় গিয়ে বসি, মনে এসে ভর করে পূর্ণিমার আলোয় থিকথিক শিমলার কথা । শিমলার মতন এমন সাদা আলোর দেশ কখনো দেখেছো ?

দেখেছি ।

কোথায় ?

বাংলাদেশে ।

ঠিক আছে বলো, শুনি ।

আমি বলতে লাগলাম,

শীতকালে গ্রামের বাড়ি ফিরছিলাম যমুনা নদী দিয়ে । নৌকায় চড়ে বসেছি । শীতকাল বলে কিছুদূর পর পর চর পড়েছে, সেই চরকে ঘিরে কাশ ফুলের বাগান । সেদিন ছিলো ভরা পূর্ণিমা, চাঁদের আলোতে থৈ থৈ করছে চারিপাশ । আমাদের নৌকাটা কাশফুলের পাশ দিয়ে যেতে শুরু করলো । ধবধবে কাশ ফুল আর পূর্ণিমার আলো মিলেমিশে সাদা আলোয় পরিণত হলো । যদিকে তাকাবে শুধুই সাদা, এ আরেক সাদা আলোর দেশ ।

শিমলা বললো,

নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়, জীবনানন্দ দাশ সম্ভবত তোমার দেখা কাশফুলের বাগান দেখে এমন লিখেছেন ।

হয়তোবা, এই বলে হেসে দিলাম, কিছু বললাম না ।

শিমলা বললো, আর বালু চরে যে সাদা বালু চিকচিক করছিলো, তা তো বললে না ?

চাঁদের আলো আর বালুর রকমারি আমাদের নিয়ে গেলো এক রূপকথার দেশে । সে আরেক সাদা আলোর দেশ । এমন এক দেশ যা আগে কখনো দেখিনি, এই বলে আমি চুপ হয়ে গেলাম ।

শিমলা কিছু বললো না । অল্প অল্প হাসতে লাগলো ।

আমি বললাম, হাসছো যে ?

না এমনি । একটা মজার কথা মনে পড়েছে তাই হাসছি ।

বলো শুনি ।

অন্য দিন বলবো । সব বললে তো ফুরিয়ে গেলো ।

আমি আর কথা বাড়ালাম না ।

দেখতে দেখতে ব্রেকফাস্ট আওয়ার শেষ হয়ে এলো । আমাদের খাওয়া শেষ হয়েছে । আমি পরিষ্কার রুমালে হাত মুছে নিয়েছি । চায়ের কাপও খালি হয়ে এসেছে ।

শিমলা বললো,

একদিন আসো না আমার অফিসে ? চার তলায় বসি । ওখানে গিয়ে যে কেউকে বললে আমার অফিস দেখিয়ে দেবে ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

কিছু লাগলে আমাকে ফোন দিও, এ বলে ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে দিলো । ঝক ঝকে সাদা কার্ড । ডান দিকে হোটেলের লগো । বায়ে ছোট্ট করে লেখা, Shimla Acharzo, Executive Manager (Operational and Accounts).

লিফটে চড়ে বসেছি । লিফট আমাকে পৌঁছে দেবে পনের তলায় । নিঃশব্দে লিফটটা ছুটে চলেছে । আমার শুধু মনে হতে লাগলো, শিমলা কেন অল্প অল্প হাসতে লাগলো ? আমি কি অস্বাভাবিক কিছু বলেছি ? এই সব ভাবতে ভাবতে কখন লিফটের দরজা খুলে গেছে, খেয়াল করিনি । লোকজন ঢুকতে শুরু করেছে । আমি নেমে হাঁটা দিলাম রুম বরাবর ।

নানা নুয়া থেকে সাকেত

সুকুমভিট রোডের পাশেই খাল । চাও-ফেয়া নদী থেকে গড়িয়ে এসে এই খাল ব্যাংককের ভেতর দিয়ে চলে গেছে । নৌপথে শহরের লোকজন যাতায়াত করে এই পথে । কিছুক্ষণ পর পর ঘাট । লোকজন দাঁড়িয়ে থাকে ঘাটে । প্রতি দশ মিনিট পর পর একটা বোট আসে, লোকজন নেমে যায় আবার উঠে পড়ে কয়েকজন । ছেড়ে দেয় নৌকা ।

আমার হোটেল সুকুমভিট রোডে । সেখান থেকে পায়ে হেঁটে খালের ঘাটলায় এলাম । ঘাটের নাম নানা নুয়া । বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে বোটের জন্য । খালটা তেমন চওড়া না, খুব বেশি হলে দু তিনটে বোট পাশাপাশি যেতে পারবে । যখন বোটটা এগিয়ে চলে, তখন খালের ঢেউ আছড়ে পড়ে দুই পাড়ে তাই খালের পাড় মজবুত করে বাঁধানো হয়েছে যেন শহরের ভূমি ধসে না যায় ।

বোটটা আসতেই লোকজন নেমে এলো । আমরা যে কয়জন অপেক্ষা করছিলাম, তারা চড়ে বসলাম বোটে । একটু পরেই ঘড় ঘড় শব্দে বোটটা চলতে শুরু করলো । সাকেত গিয়ে পৌঁছাবে যানটা ।

বোটটা ছুটে চলেছে । খালের পাড় দিয়ে ছোট-ছোট ছাপরার ঘর, কি সুন্দর ছোট ছোট বাগান করেছে সবাই । কেউ কেউ আবার ঘর থেকে লতা-পাতা বুলিয়ে দিয়েছে খালের পানিতে । কতগুলো ছেলেপুলে দেখলাম উঁকি মারছে জানালা দিয়ে । আমি হাত উচিয়ে দিতেই ওরা হাত বাড়িয়ে দিলো ।

সামনের একটা ঘাটে নেমে গেলাম । ভাবলাম এর পরের বোটে সাকেত যাবো । খালের পাড়ে যে সব সাজানো ঘর-বাড়ি দেখেছি, সে গুলোর ছবি তুলবার খুব লোভ হলো । সাথে আছে SLR ক্যামেরা । এইটে দিয়ে সাটার স্পীড, এ্যাপারচার আর আলোর একটা যুৎসই সমন্বয় করে নিখুতভাবে ছবি তোলা যায় ।

ছেলেবেলা থেকে ফটোগ্রাফির উপর আগ্রহ ছিলো। সুযোগ পেলে এদিক ওদিক ছবি তুলতাম। সবচেয়ে বেশি ছবি তুলেছি পুরোনো ঢাকার কোনা কাঞ্চির। যেমন, পুরোনো দেয়াল চুইয়ে পানি পড়ছে অথবা অন্ধকার গলির মাথায় এক টুকরো সূর্যের আলো। মাঝে মাঝে উপযুক্ত সানলাইটের জন্য অপেক্ষা করেছি ঘন্টার পর ঘন্টা। কত রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি পূর্ণিমার যুৎসই Angel পাবার জন্য। যখন যুৎসই আলো পেয়েছি, ঝটাপট ছবি তুলে ফেলেছি। তারপর শুতে গেছি।

হাঁটতে হাঁটতে ফুলে-ফুলে সাজানো বাড়িগুলোর সামনে এলাম তারপর সূর্য মাঝে মাঝে যুৎসই অবস্থানে রেখে ছবি তুলতে লাগলাম একের পর এক নানা Angel থেকে। এই আলোর ব্যাপারটা ঠিক মত ফায়সালা না হলে, সব চেষ্টা ভেঙে যাবে। তাই আলো আর ছায়া, এই দুই ব্যাপারকে মাথায় রেখে ছবি তুলে চলেছি। আলোটা একটু কম হলে ভালো হতো কিন্তু সূর্য মাঝে মাঝে যে বলবো একটু সরে দাড়াও, তার যো নেই। আমাকেই অপেক্ষা করতে হবে তার সরে যাওয়া পর্যন্ত।

দেখলাম কতগুলো ছেলেপুলে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদেরকে দাঁড় করিয়ে দিলাম লাইন ধরে তারপর ঝটাপট ছবি নিলাম। ঐ যে একটা বোট ধেয়ে আসছে। ক্যামেরায় বন্দি করলাম বোটটাকে। মনে মনে ভাবলাম, বৃষ্টি নামলে খুব ভালো হতো। বৃষ্টির ছিটে-ফোঁটার মধ্যে, এই লতা-পাতা ঘেরা ঘুপচি ঘর গুলো খুব ভালো আসতো। বাংলাদেশ হলে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতাম কিন্তু বিদেশে বিড়ুইয়ে অন্য মানুষের বাড়ির উঠোনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। SLR ক্যামেরাটা বাক্সে বন্দি করে নেমে এলাম ঘাটলায়। এখান থেকে সাক্ষাৎ যাবো খাল মাড়িয়ে।

ব্যাংকক শহরে আড়াআড়িভাবে এই খাল। শহরের হাজার হাজার মানুষ এই পথে যাতায়াত করে প্রতিদিন ফলে শহরের উপর চাপ কমে আসে। খালের পথে যেহেতু Traffic Jam নেই, লোকজন ঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। ঢাকা শহরেও এরকম অনেক খাল ছিলো। এখন সে সব বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে গড়ে উঠেছে রাস্তাঘাট, ঘর-বাড়ি আর আবাসন প্রকল্প ফলে ঢাকা শহরে জলাবদ্ধতা নিত্য-দিনের ব্যাপার। একটু বৃষ্টি হলে পানি জমে যায়, গড়িয়ে যেতে পারে না।

আবার নৌকাতে চড়ে বসেছি । আবার সেই ঘড় ঘড় শব্দ । রাস্তায় অনেক ছবি তুললাম । ঘর-বাড়ি, ফিরতি বোট আর দুই-পাড়ের ছবি । দেখতে দেখতে সাকেত চলে এলো । এইটে শেষ ঘাট । বোট থেকে নেমেই চোখে পড়লো বুদ্ধের Temple, অহিংস মানব গৌতমের উপাসনালয় ।

www.sayedhossain.com

প্রাতু নাম

প্রাতু নামে এসেছি কিছুক্ষণ হলো । এখানে বেশ কিছু শপিং মল আছে । হোটেলের ফ্রিজে রেখে দেবার জন্য কিছু খাবার যেমন, ব্রেড, বাটার, ফুটস ইত্যাদি কিনবো । মাঝে মাঝে রাতে ক্ষুদা লাগে, কিছু না খেলেই না ।

সুন্দর করে আম, পেয়ারা, কেটে রেখেছে একজন বিক্রেতা । কয়েকটা নিয়ে নিলাম । ফলওয়ানা সেধে দাম কম রাখলো । বললো, আবার এসো এরপর থেকে ওর কাছে ফল কিনি ।

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে । কাল ছুটি বলে মার্কেটে খুব ভিড় । অনেকেই এসেছে কেনা-কাটা করতে । ভাবলাম Dinner করে হোটেল ফিরি । কোথায় খাবো তা নিয়ে ইতস্তত করছি । হঠাৎ কে যেনো বলে উঠলো, কখন এসেছো ?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম শিমলা, শিমলা আচার্য । আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে । আমি বললাম, একটু আগে । তুমি ?

আমিও এলাম এই মাত্র । কি কি কিনলে ?

কিছু Fruits আর Canned খাবার ।

এই Canned খাবার খেও না সাইদ, Industrial Item এ ভরা । পেটে গিয়ে জ্বালাতন করবে । তোমাকে ভালো হোটেল দেখিয়ে দেবো ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

শিমলা বললো, Fruits গুলো ভালো । আমি তো Regular Fruits খাই ।

তোমাকে দেখলে বোঝা যায় ।

কিভাবে বুঝলে ?

সব সময়ে ফ্রেশ ফ্রেশ ভাব । কোথাও কোন দুঃখ নেই ।

তাই, বলে শিমলা হেসে দিলো । অনেকক্ষণ হাসলো মেয়েটা ।

আমি বললাম, হাসছো যে ?

না এমনি । তোমার কথাগুলো খুব নূতন । আগে কখনো শুনিনি এভাবে । চলো, ডিনার করি । আজ তুমি আমার মেহমান ।

ঠিক আছে, আমি মাথা নাড়লাম ।

শিমলা বললো,

ঐ চৌরাস্তা পেরুলে একটা হোটেল আছে । শাক-শবজি দিয়ে হাজার পদের রান্না করে ওরা । তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না ।

তুমি কখনো খেয়েছো ?

অনেক বার । চলো আর দেরি করি না ।

রাস্তা পেরিয়ে আমরা নির্জন জায়গায় চলে এসেছি তারপর একটু বাঁক নিতেই হোটেলটা । দোতলা হোটেল, বকবাকে পরিস্কার । সামনে এক ফালি বাগান, সেই বাগান পেরিয়ে হোটেলের চত্বর । আমরা ঢুকতেই সাদা পোশাকের ওয়েটার এসে দাঁড়ালো । মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, প্লিজ, এদিকে ।

মস্ত বড় ঘর, কাঠের আসবাবে সাজানো । সুন্দর করে ক্লথ বিছিয়েছে টেবিলের উপরে । হালকা মিউজিক ভেসে আসছে ওদিক থেকে সম্ভবত থাই কোন মিউজিক । ঘিয়া রঙের আলোতে ভরে আছে ঘরটা ।

আমরা গিয়ে কোণায় বসলাম । তেমন লোকজন নেই, তিন চারটা ফ্যামিলি চোখে পড়লো । দেখে বুঝলাম এরা সব Indian Muslim ।

শিমলা বললো, কি খাবে ?

ভাত ।

ভাতের সাথে টমেটো, সালাদ আর শাক-শবজি দিতে বলি ?

বলো ।

Drinks কি খাবে ?

Mango juice দিতে পারো ।

ওয়েটার এসে অর্ডার নিয়ে গেলো ।

শিমলা বললো,

এ হোটেলের মালিক একজন Indian Muslim । মাদ্রাজ থেকে এসেছিলেন ভদ্রলোক তারপর এক থাই মেয়ের প্রেমে পড়ে বিয়ে থা করে থেকে গেছে । রাস্তা পেরুলো ওর বাসা ।

এ রকম পরিবার কি আরো আছে ?

অনেক আছে সাইদ । থাই মেয়েরা ট্র্যাডিশনালি স্বামি ভক্ত আর পরিশ্রমি তাই বিদেশীদের ধরে রাখতে ওদের বেগ পেতে হয় না ।

আমি বললাম, তোমার কথা শুনে লোভ হচ্ছে । মনে হচ্ছে কোন থাই মেয়ের হাওলায় নিজেকে ছেড়ে দেই ।

তাই, বলে শিমলা হেসে দিল । তারপর বললো, তোমার মতন হাসিবও বলতো কিন্তু ওর affair ছিলো বাংলাদেশের এক মেয়ের সাথে তাই ওকে থাই মেয়ের আশ্রয় নিতে হয়নি ।

তখন বুঝি তোমার হৃদয়টা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো ?

না সাইদ । হাসিব তো শুধুই বন্ধু । এর বাইরে আমরা দুজনের কেউ ভাবতাম না ।

আমি বললাম, Sorry, মাফ করবে, এমনি এমনি বলেছি ।

It is all right, I know that ।

আমি বললাম,

সেদিন এক বাংলাদেশীর সাথে আলাপ হলো । ভদ্রলোক ছোটখাট চাকরি করেন । থাই মেয়ে বিয়ে করেছেন । বউয়ের খুব প্রশংসা করলো । তার বউ ঘর-বাড়ি সাজিয়ে রাখে, কাজের মেয়ে রাখতে চাইলে রাখতে দেয় না । বলে আমি একাই পরবো, তুমি খামাখায় খরচ করবে কেনো ? ওদের দুই মেয়ে, সকুলে পড়ে । খুব ভালো আছেন ভদ্রলোক । কথায় কথায় হাসেন ।

শিমলা হেসে দিলো, কিছু বললো না । মনে হলো সে খুব গর্ব বোধ করছে ।

আমি বললাম, যদি কিছু মনে না করো তো একটা প্রশ্ন করি ?

ঠিক আছে করো ।

তোমার বাসায় কে কে আছে ?

এইটে নিয়ে এত ইতস্তত করবার কি আছে? আমরা দুই বোন, আমি বড় । ছোট বোনটার বিয়ে হয়ে গেছে । ব্যাংকে চাকরি করে, ওর হাসব্যান্ডও ব্যাংকার । ওদের একটা ফুরফুরে মেয়ে আছে, নাম অর্চনা । মাটির নিচ দিয়ে হাঁটে ।

আমি বললাম, অর্চনা নামটা সুন্দর । এ তো ভারতীয় নাম ?

শিমলা বলতে লাগলো, ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি থাইদের ব্যাপক প্রভাবিত করে । আমরা যে থাই ভাষায় কথা বলি, তা সম্ভবত সস্কৃত থেকে এসেছে । থাই সমাজের অনেক কিছু ভারতীয়দের কাছ থেকে নেয়া ।

আমি বললাম, আর কে কে আছে তোমাদের বাসায় ?

বাবা নেই, মারা গেছেন বছর খানেক হলো । মাকে নিয়ে শহরের শেষ প্রান্তে আমরা থাকি । চাও-ফ্রেয়া নদী লাগোয়া আমাদের বাসা । মাঝে মাঝে নদীতে বেড়াতে যাই ।

আমি বললাম, তাহলে বিয়ে শাদি করনি ?

করবার সময় পেলাম কৈ ? Thammasat থেকে বেরিয়ে পড়তে গেলাম অস্ট্রেলিয়ায় । MBA করতে দুই বছর তারপর পাঁচতারা হোটেলে জয়েন করেছি । সব কিছু গুছিয়ে নিতে নিতে সময় চলে গেলো ।

আমি হেসে বললাম, এখন তো আর বিয়ে শাদিতে বাধা নেই । ভাল চাকরি করো, সংসারে ঝুট ঝামেলা নাই ।

এতো দিন কেঁরির নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম । আমার বরাবরি প্ল্যান ছিলো ভাল মতন না দাঁড়িয়ে বিয়ে থা করবো না ।

এখন তো দাঁড়িয়ে গেছে । সেরা হোটেলের সেরা ম্যানেজার ।

Yes এখন আর অসুবিধা দেখছি না কিন্তু রাজপুত্রটি তো এসে বলছে না, শিমলা, আমি এসেছি, উঠে এসো আমার নৌকায়, এখনি পাল উড়াবো ।

তুমি তো সব দরজা-জানালা বন্ধ করে রেখেছো ? রাজপুত্র ঢুকবে কিভাবে ? ব্যাংকক শহরের সুন্দরী, শিক্ষিত ও ধনাঢ্য তরুণীর তো রাজপুত্রের অভাব হবার কথা না ।

শিমলা এইবার লজ্জা পেয়ে গেলো । বললো,

যাও, দরজাটা খুলে দিলাম, যতটুকু খোলা যায়, এই বলে আবারও হেসে উঠলো । আমি তাকিয়ে দেখলাম হাজারো নক্ষত্রের আলো এসে পড়েছে আমার চারিপাশে ।

একটু আগে বেয়ারা খাবার দিয়ে গেছে । সবগুলোই ভেজিটেবল আইটেম । বাংলাদেশ ষ্টাইলে রান্না ।

আমি বললাম, এ যে বিশাল আয়োজন । আমার দুদিন লাগবে ।

আস্তে আস্তে খাও । দেখবে ঠিক ঠিক খেতে পারছো ।

আমরা খেতে শুরু করেছি । খেতে খেতে দেখলাম, ওপাশে টেম্পলের চূড়া । চোঙা হয়ে আছে মাথাটা । মাথায় একটা বাতি ।

আমি বললাম, ব্যাংকক শহরে বুঝি টেম্পলের অভাব নেই ?

না । চারিদিকে তুমি টেম্পল দেখতে পাবে । এদেশের মানুষেরা বুদ্ধাকে খুব মেনে চলে । এদেশের শিল্প সাহিত্য আর সংস্কৃতিতে বুদ্ধা মিশে আছে ।

আমি বললাম,

তোমাদের ধর্মে না আছে ঈশ্বর, না আছে স্বর্গ-নরক । এই ঈশ্বরহীন, স্বর্গহীন বুদ্ধাকে সকল ধর্ম থেকে আলাদা করে রেখেছে ।

হু, বলতে পারো । আমার মা তো নিয়মিত বুদ্ধার সাথে কথা বলেন ।

আমি বললাম, সেটা কি রকম ?

শিমলা বললো,

আমার মার মনে হয় সে সব সময় বুদ্ধাকে কাছে পায় বিপদ-আপদে । এ দলে আমার মা একা নন, এ দেশের হাজার হাজার মানুষ তাদের সুখ দুঃখ বুদ্ধাকে জানায় । বুদ্ধা একটা সমাধানের চেষ্টা করেন ।

আমি বললাম,

ধর্ম আছে বলে আমরা অনেক বল পাই । যখন কোথাও কোন সমাধান খুঁজে পাই না, তখন ধর্মের মধ্যে উত্তর খুঁজতে থাকি তারপর ঠিক ঠিক জবাবটা পেয়ে যাই তারপর সেই সান্তনা নিয়ে বৈচে থাকি ।

যারা ধর্ম মানেন না, তারা সান্তনা কৈ পায় সাইদ ?

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, উত্তরটা আমার জানা নেই তবে নিশ্চয় একটা যুৎসই উত্তর আছে ।

শিমলা কিছু বললো না ।

হোটেলের ঘড়িতে রাত দশটা বাজলো । আমাদের ডিনার শেষ হয়েছে । যে তিন-চারটে ফ্যামিলি খেতে এসেছিলো ওরা ফিরে গেছে । আমরাই শুধু রয়ে গেছি ।

শিমলা বললো, আইসক্রিম দিতে বলি ?

না । আর পারবো না, ক্ষমা করো ।

ঠিক আছে, এই বলে কাউন্টারে গিয়ে বিল দিয়ে এলো ।

আমরা বেরিয়ে এলাম । রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা । দুধারে ঘন সবুজ গাছ আর তারি মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার রাস্তা । মনে হলো কিছুদিন হলো সুরকি বিছিয়েছে । সুরকি-সিমেন্টের ঝাঝালো গন্ধ এখনো ভেসে বেরাচ্ছে ।

শিমলা বললো, তোমার সময় হবে ?

হ্যাঁ । কেনো ?

চলো । একটু পার্কে গিয়ে বসি ।

একটু হাটতেই পার্ক চলে এলো । সারিবদ্ধভাবে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে । কোথাও কোন ময়লা চোখে পড়লো না । প্রতিটা বসার জায়গা পরিষ্কার-ঝকঝকে । মাঝে মাঝে দুই একটা বাতি জ্বলছে আশেপাশে । সেই আলোতে কতগুলো বাচ্চা দৌড়াদৌড়ি করছে । আগামী কাল ছুটি বলে অনেকেই এসেছে পার্কে । পার্কের কিছুদূর পর পর হালকা পানির ব্যবস্থা । লোকজন সেখান থেকে Drinks কিনে খাচ্ছে । দুই একটা ফ্যামিলি চোখে পড়লো দূরে ।

হালকা আলো আঁধারী মাড়িয়ে দূরের একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম আমরা । এখান থেকে পুরোটা পার্ক দেখা যায় । কেমন যেন নীরবতা । শিশির পড়ছে ধীরে ধীরে । আমার মনে হলো আমরা বুঝি লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছি ।

শিমলা বললো, পানি খাবে ?

ঠিক আছে, তুমি বস । আমি নিয়ে আসি ।

না । আজ তুমি আমার মেহমান, এই বলে শিমলা দোকান থেকে পানি নিয়ে এলো ।

পানি খাচ্ছি দুজনে আর সামনে বিস্তৃত খোলা জায়গার দিকে তাকিয়ে আছি অনিমেঘ নয়নে । সারাটা আকাশ নক্ষত্রে ছেয়ে আছে । আকাশে এক তিল মেঘ চোখে পড়লো না । দক্ষিণের উরু হাওয়া আমাদের নাড়িয়ে ফিরছে । মাঝে মাঝে শিমলার দীর্ঘায়িত চুলের দুই একটা আঁশ এসে পড়ছে আমার ললাটে । Sorry বলে শিমলা আগলে নিচ্ছে বার বার ।

আমি বললাম, জীবনানন্দের একটা কবিতা শোনাতে পারো ?

কোনটা শুনতে চাও ?

তোমার পছন্দের যে কোন একটা ।

হাওয়ার রাত শুনবে ?

বেশ শুনাও । এখন তো সত্যি সত্যি রাত হয়েছে ।

ঠিক আছে শোনো, এই বলে শিমলা বলতে শুরু করলো,

গভীর হাওয়ার রাত ছিলো কাল- অসংখ্য নক্ষত্রের রাত
সারা রাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে ;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমি সমুদ্রের পেটের মতন,
কখনো বিছানা ছিড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে :

আমি বললাম, হাওয়ার রাত কবিতাটা কোন কাব্য গ্রন্থের ?

বনলতাসেন কাব্য গ্রন্থের তৃতীয় কবিতা । এ কবিতাটাই বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের প্রাণ ।

জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্য গ্রন্থ কোনটা শিমলা ?

ঝড়পালক । ঝড়পালক দিয়ে কবির যাত্রা শুরু তারপর বনলতা সেন কবিকে খ্যাতির শীর্ষে
নিয়ে যায় । অবশ্য ধূসর পাণ্ডুলিপি আর রূপসী বাংলাকে খাটো করে দেখলে ভুল হবে ।

তোমার প্রিয় কোনটা ?

শিমলা উত্তর দিলো,

সবার আগে বনলতা সেন তারপরেই রূপসী বাংলা । রূপসী বাংলা আর বাংলাদেশের খাল,
বিল, ক্ষেত একাকার হয়ে আছে । কবির মতন করে কেউ দেখেনি বাংলাদেশকে ।

আমি কিছু বললাম না ।

শিমলা বললো, একটা মজার ব্যাপার খেয়াল করেছো ?

কি শিমলা ?

জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্র যুগের কবি হওয়া সত্ত্বেও কেমন রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত কবিতা রচনা করেছেন
। তার কবিতায় কারো পদচারণা চোখে পড়বে না । রবীন্দ্রনাথ নিজেও জীবনানন্দের প্রশংসা করতেন ।
একটু থেমে শিমলা আবার বললো,

জীবনানন্দ দাশের কবিতাগুলো পড়লে মনে হয় ও বড় দুঃখী ছিলো । দুঃখে দুঃখে কেটেছে
ওর সারাটা জীবন । কি বলো ?

আমি চুপ হয়ে রইলাম অনেকক্ষণ । বললাম, হয়তোবা, ঠিক বলতে পারছি না ।

শিমলা বলতে শুরু করলো,

সুখের মধ্যে থেকে খুব কম মানুষি পেরেছে নূতন কিছু বানাতে । সুখের কাছে শিখবার তেমন কিছু নেই । সুখ সহসাই আসে আবার মরিচিকার মতন মিলিয়ে যায় । আজকের এই সভ্যতা, শিল্প ও কৃষ্টি সবই আমরা অর্জন করেছি অনেক দুঃখ, কষ্ট আর উত্তাপের মধ্যে দিয়ে । জীবনানন্দ দাশ হয়তো খুব দুঃখী ছিলেন তাই এমন জগৎ জয়ী কবিতা লিখতে পেরেছেন ।

আমি বললাম,

তাহলে তো নজরুলের কথা বাদ দিলে চলবে না । অনেক কষ্টে জীবন পার করেছে এই কবি । খেয়ে না খেয়ে জীবন কেটেছে ওর । নজরুলের গান, কবিতা এখনো আমরা শুনি ।

দুজনেই চুপ হয়ে বসে আছি । কেউ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না ।

আমি বললাম, তুমি কবিতা লেখো ?

কিছু কিছু ।

একটা শোনাও ।

থাক । আরেক দিন ।

আমি অনুরোধের সুরে বললাম, আজই বলো না ?

কিন্তু তুমি হাসতে পারবে না । ঠিক?

এই যে মুখে টেপ আটাই, এই বলে আমি হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরলাম ।

শিমলা হাত দিয়ে আমার হাত সরিয়ে বললো, তার দরকার হবে না । তোমাকে শোনাবো । তোমার সাথে যেদিন পরিচয়, সেদিন ছিলো আমার জন্মদিন । আমারও জন্ম হলো, তুমিও এলে ।

আমি কিছু বললাম না । চুপি চুপি বসে রইলাম । আকাশে বিস্তীর্ণ হাজারো নক্ষত্র আমাদের আলো দিয়ে চললো ।

শিমলা বললো,

শোনো তাহলে । আগেভাগে বলে রাখি এই কবিতাটা পুরোপুরি আমার নয়, জীবনানন্দের প্রভাব পুরোপুরি কাজ করেছে । শুনলেই বুঝতে পারবে ।

ঠিক আছে শোনাও ।

শিমলা বলতে শুরু করলো ।

হাজারো বৃষ্টির কণা আছড়ে পড়ছে
আমার চাড়িপাশে ।
হাজারো নক্ষত্র ঝরে পড়ছে,
আমার আঙ্গিনায় ।
সেই হাজারো নক্ষত্রের ভিড়ে আমি তোমায় খুঁজেছি,
শতাব্দী ধরে ।
তারপর একদিন তোমায় পেলাম
নীল সবুজের দেশে ।

কেমন লাগলো সাইদ ?

ভালো । মজার ।

শিমলা বললো,

সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানো ? আমি যে ভাবেই কবিতা লিখি না কেনো জীবনানন্দের ভাবধারা চলে আসে । কোন ভাবেই সেটার উর্দ্ধে গিয়ে লিখতে পারি না । আমার মনে হয় আমি একা নই । যারা জীবনানন্দের ভাবধারায় কবিতা লিখেন, তারা পুরোপুরি জীবনানন্দ প্রভাব মুক্ত হয়ে লিখতে পারেন না । জীবনানন্দ চলেই আসে ।

হতে পারে শিমলা । হতে পারে কিন্তু মজার একটা ব্যাপার খেয়াল করেছো ?

কি সাইদ ?

তুমি আমার দেশের কবিদের নিয়ে যতো জানো, আমি তার সিকি ভাগও জানি না । কি একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ।

তুমি জানো না মক্কার লোকেরা হজ্জ পায় না ?

ঠিক তাই, এই বলে আমরা দু জনে হেসে উঠলাম ।

আমি বললাম, এই জীবনানন্দ কে নিয়ে একটা মজার ঘটনা মনে পড়লো । সেবার যে কি বিপদে পড়েছিলাম । শুনবে ঘটনাটা?

প্লিজ বলো ।

আমি বলতে শুরু করলাম,

ছাত্র জীবনে কিছু কিছু জীবনানন্দ দাশ পড়তাম । সেই সুবাদে একদিন মনে হলো আমি অনেক জেনে ফেলেছি । সেটাই কাল হয়ে দাড়ালো ।

সেটা কি রকম ?

তবে শোনো, আমি বলতে শুরু করলাম,

জীবনানন্দের লেখা *তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে*, এই লাইনটা সকল নষ্টের মূল । তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি । একদিন আমার এক বন্ধুর বন্ধু বাসায় এসে হাজির । সে ছিলো আবার জীবনানন্দ বিশেষণ, সে কথা আমার জানা ছিলো না । কি যেন এক প্রসঙ্গে আমি বললাম, *তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে* এই লাইনটা শিকার কবিতায় । বন্ধুর বন্ধুটি একটু আপত্তি করলো । বললো, তুমি মনে হয় কোথাও ভুল করছো, সাইদ । আমি বললাম, মনে হয় না । সেই ছেলেটা তখন কিছু বললো না তবে যাবার সময় বললো, তুমি একটু চেক করে নিও কবিতাটা । আমি মাথা নেড়ে বললাম, আমার কোন সন্দেহ নেই, আমি ঠিক বলছি । তখন আমার বন্ধুটি বললো, তোমরা দুজনে কথা না বাড়িয়ে বাজি ধরলেই পারো ?

আমি বললাম, ঠিক আছে । একশত টাকা বাজি ।

বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আসা হলো । এই কাব্য গ্রন্থেই শিকার কবিতাটা দেয়া আছে । তন্ন তন্ন করে শিকার কবিতা খোঁজা হলো । *তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে* লাইনটা কোথাও পাওয়া গেলো না । এক শত টাকা দিতে হলো । সেই জামানায় একশ টাকা অনেকখানি বিশেষত একজন ছাত্রের জন্য তো বটেই । সেই থেকে বাজি ধরা ছেড়ে দিয়েছি ।

শিমলা শুনে অনেকক্ষণ হাসলো । হাসি থামতেই চায় না ওর । আমার মনে হলো, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ গুলো ঝুঁকে পড়েছে শিমলার হাসি শুনতে ।

শিমলা হাসি থামিয়ে বললো, তারপর কি করলে ?

কি আর করবো ? নিজেকে শুধরাতে লাগলাম ।

তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে এই লাইনটি কোন কবিতার ?

সে তো তুমি ভালো করেই জানো শিমলা ।

জানি । তারপরেও তোমার মুখে শুনতে চাইছি ।

আমি বললাম,

তোমার সাথে প্রথম যেদিন পরিচয়, সেদিন তুমি কবিতাটা আবৃত্তি করেছিলে । কবিতার নাম আকাশলীনা ।

ঠিক তাই, এই বলে শিমলা হেসে দিলো । বললো, আমার শিক্ষক ডক্টর নাও আবার রবার্ট হুটম্যানের ভক্ত । কথায় কথায় উনি হুটম্যান ছাড়তেন । আমাদেরও ভালো লাগতো । হুটম্যান নিয়ে উনার মতো বিশেষণ এই আসিয়ানে পাবে না তুমি । এই হুটম্যান নিয়ে মজার একটা ঘটনা শুনবে ?

বলো শুনি ।

শিমলা বলতে লাগলো,

রবার্ট হুটম্যানের কবিতার বই ছাপানোর পর কেউ আমলে আনলো না কিন্তু কিছু কাল যেতেই সবাই বুঝতে পারলো তার কবিতার মর্মার্থ । তখনি হাক ডাক পড়ে গেলো চারিপাশে ।

আমি বললাম, তুমি কি হুটম্যান নিয়ে কাজ করো ?

না । আমি কাজ করেছি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে । আমাদের একটা থিসিস লিখতে হতো ব্যাচেলার ডিগ্রীতে । আমার থিসিসের টাইটেল ছিলো: সমকালীন বাংলা সাহিত্য আর জীবনানন্দ দাশ ।

আমি বললাম, এ যে দারুণ ব্যাপার । তোমার থিসিসটা দেখতে পারি ?

আলবৎ পারো । লাইব্রেরিতে পাবে এক কপি তবে তুমি চাইলে আমার পারসোনাল কপিটা ধার নিতে পারো ।

বেশ ধারই দাও । একটু পড়ে দেখি ।

শিমলা হেসে দিলো । কিছু বললো না ।

এশিয়ার অর্থনৈতিক ধস

নব্বই দশকের শেষের দিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে ঘটে গেল অর্থনৈতিক ধস । এশিয়বাসীরা কখনো এত বড় ধস দেখেনি । এই ধসের শুরুটা কিন্তু থাইল্যান্ডে, Land of Smiles এর দেশে । থাইল্যান্ড এমন একটা দেশ যা কখনো পাশ্চাত্যের কলনিতে পরিণত হয় নি অথচ আশেপাশের দেশ গুলো কোন না কোন ভাবে পাশ্চাত্যের অধীন ছিলো । থাইল্যান্ডের চারিধার জুড়ে আছে মালয়শিয়া, লাওস, মায়ানমার আর কম্বোডিয়া । এর মাঝে চিতল মাছের মতন লম্বা হয়ে শুয়ে আছে থাইল্যান্ড । হাসি খুশির দেশ ।

হাসিখুশির দেশ আর হাসিখুশি রইলো না । থাইল্যান্ডে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক ধস দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের দেশগুলোতে । সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আসিয়ান পরিবারের সদস্যরা । দশটি দেশ নিয়ে আসিয়ান পরিবার, যেমন মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, লাওস, ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়া । এই অর্থনৈতিক ধস একদিনে আসেনি । দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল ধসের বীজ । তারপর মেঘ এতো ভারী হলো যে শুরু শুরু করে নেমে এলো বৃষ্টি । শুরু হলো এশিয়ার ক্রান্তিকাল । একদিন যাদেরকে Asian Tiger বলা হতো, তারা পরিণত হলো চুপসে বিড়ালে ।

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের গোড়াপত্তন হয়েছিলো ইংল্যান্ডে । তারপর তা ছড়িয়ে পরে সারা ইউরোপে । যেহেতু ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে দেনা-পাওনা, আদান-প্রদান চলতো নিরন্তর, তাই এই বিপ্লবের বিস্তার ঘটতে একদমি সময় লাগে নি । রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ে এই বিপ্লব সারা ইউরোপ জুড়ে । ঠিক একই ভাবে থাইল্যান্ডে উদ্ভূত অর্থনৈতিক ধস ত্বরিত বেগে ছড়িয়ে পরে আসিয়ান পরিবারে । শুরু হয় অর্থনৈতিক দৌলুপাতা ।

আশির দশকের গোড়া থেকে নব্বই দশকের শেষ অবধি আসিয়ানদের পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি । চারিদিকে শুধু জয় জয়কার । ঝাড়া এই সতর বছর ব্যাপক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে আসিয়ানরা একটা শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে গেলো । শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর বাসস্থান এই তিন মৌলিক চাহিদা প্রায় সকলের নাগালের মধ্যে চলে আসে । মানুষের আয় বেড়ে যায় ছ ছ করে । জীবন যাত্রার মান আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেড়ে একটা ভাল যায়গায় অবস্থান নেয় ।

তবে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে চলে যায় সিঙ্গাপুর । শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান খাতে আসিয়ানদের ডিঙিয়ে ইউরোপিও স্তরে উন্নীত হয় সিঙ্গাপুর । আজো তারা সেই স্তর ধরে রাখতে পেরেছে । এখন প্রশ্ন হলো আসিয়ানরা কিভাবে ভাগ্য ফেরালো ? কিভাবে বাড়ালো জীবনযাত্রার মান ? ব্যাপক বৈদেশিক বিনিয়োগ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শিক্ষা খাতে বিপুল বরাদ্দ, বিনিয়োগ বান্ধব নীতি, নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার আসিয়ানদের ভাগ্য পরিবর্তনে সাহায্য করলো ব্যাপক ভাবে । কিন্তু হঠাৎ করে আসা অর্থনৈতিক ধস সব অর্জনকে স্কান করে দিয়েছিলো ।

অর্থনৈতিক ধসের কারণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত । কেউ কেউ বলেন, আসিয়ানদের অর্থনীতি ব্যবস্থাপনায় স্বল্প অভিজ্ঞতা, তাদেরকে এই ধসের মধ্যে ফেলে দেয় । আবার অনেকে বলেন, আসিয়ানরা খুব চটজলদি তাদের অর্থনীতি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো বিশ্ব বাজারে যা শেষমেষ সামাল দিতে পারে নি ওরা । ইউরোপের সোভিয়েত ইউনিয়ন আর এশিয়ার আসিয়ানরা তাদের অর্থনীতি খুব তাড়াতাড়ি উন্মুক্ত করতে গিয়ে নিজেরাই উন্মুক্ত হয়ে পড়ে ।

আজকের চিন কিন্তু আসিয়ান আর সোভিয়েত ইউনিয়নের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের নীতি সাজিয়েছে । চিনারা তাদের অর্থনীতি শমুক গতিতে উন্মুক্ত করছে যেন তাদের দেশ সেই উন্মুক্ত নীতির সাথে খাপ খাইয়ে এগিয়ে যেতে পারে । ফলে চিনাদের কোন অর্থনৈতিক ধসের মধ্যে পড়তে হয়নি । **Slow and steady win the race**, এই আদর্শে বলীয়ান হয়ে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে । ফলে চিন আজ বিশ্বের উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশ ।

অনেকে বলে থাকেন, সারাটা নব্বই দশক জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদের হার বাড়িয়েছে । ফলে আমেরিকানদের Financial Asset কিনলে চড়া সুদ পাওয়া যেতো । এই অতি মুনাফার আকর্ষণে বিনিয়োগ চলে যায় আমেরিকার দিকে । ফলে দক্ষিণ এশিয়াতে মূলধনের ঘাটতি দেখা দেয় যা আসিয়ানদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয় ।

কেউ কেউ আবার বলেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে চিনের উত্থান এই ধসের মূলে কাজ করেছে । সম্ভা দ্রব্য আর সেবা সরবরাহ করে চিনারা আসিয়ানদের রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাপক ভাগ বসায় । ফলে আসিয়ানদের ব্যবসা বাণিজ্য পড়ে আসে । শুরু হয় অর্থনৈতিক ধস ।

তবে আশার কথা হলো নব্বই দশকে ঘটে যাওয়া অর্থনৈতিক ধস আসিয়ানরা কাটিয়ে উঠছে ধীরে ধীরে । আসিয়ান পরিবারে উৎপাদন বেড়েছে, বেড়েছে অর্থনৈতিক গতি আর যারা চাকরি খুঁয়েছিলেন, তারা কাজ খুঁজে পেয়েছে । আসিয়ানরা এখন মাঝারি গতিতে এগিয়ে চলেছে । আশা করা যায় আগামী দশকে এই ধসটা মিলিয়ে যাবে পুরোপুরি । আবার আসিয়ানরা Tiger এ পরিণত হবে । অর্থনৈতিক ধসের দুঃস্বপ্নটা মিলিয়ে যাবে চিরতরে ।

সাদিকা

ব্যাংকক শহরের উপর দিয়ে চাও ফ্রেয়া নদী বয়ে গেছে । এই নদীকে ঘিরে শহরের কর্মকান্ড চলিতো হয় । শিমলাদের বাড়ি থেকে চাও ফ্রেয়া নদী খুব কাছে । দশ মিনিট লাগে নদীর ঘাটলায় যেতে ।

আজ রবিবার, ছুটি ছাটার দিন । শিমলা ওর বাসায় দাওয়াত করেছে । লাঞ্চ খাবো ওদের সাথে । শিমলা পরিচয় করিয়ে দেবে ওর মার সাথে ।

দুপুর বেলায় শিমলার প্রকান্ড গাড়িটা এসে দাঁড়ালো হোটেল চত্বরে তারপর আমাকে নিয়ে ছুটলো শিমলাদের বাসায় ।

আধঘন্টা যেতেই শিমলাদের বাড়ি পৌঁছানো গেলো । ছুটির দিন বলে রাস্তায় ট্রাফিক কম । হেলে দুলে গাড়িটা এসে ঢুকলো শিমলাদের বাড়ির আঙ্গিনায় ।

শিমলা ও তার মা ট্র্যাডিশনাল থাই ড্রেস পড়েছে, ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা । লাল-নীল অনেক রঙে ঢাসা ড্রেসটা । জাপানি ড্রেসের সাথে অনেক মিল খুঁজে পেলাম, সাধারণত কোন অফিসিয়াল অনুষ্ঠানে পড়ে ওরা ।

গাড়িটা শিমলাদের বাড়িতে ঢুকতে প্রথমে চোখে পড়লো বিশাল বাঙলো । কাঠ আর বাঁশ দিয়ে বানানো । পরিষ্কার ঝক ঝক করছে সামনের দিকটা । সামনে প্রসস্ত বাগান, তারপরে বাঙলো । ডানদিকে একটা ফোয়ারা নিরন্তর পানি উড়িয়ে চলেছে ।

বাড়ির বারান্দায় দেখলাম শিমলা ও তার মা দাঁড়িয়ে আছে । আমি গাড়ি থেকে নামতে ওরা মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করলো, সাদিকা । আমিও মাথা ঝুঁকিয়ে দিলাম ।

শিমলা আমাকে ওর মার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো ।

ভদ্রমহিলার বয়স হয়েছে কিন্তু তা বুঝবার যো নেই । হেসে দিলেন ভদ্রমহিলা । এক সময়ে যে সুন্দরি ছিলেন, চোখের তারায় ফুটে উঠেছে সে কথা । আমাকে বললো, তোমার কথা অনেক শুনেছি শিমলার কাছে । আমি খুব খুশি হয়েছি তুমি আমাদের বাসায় এসেছো, ভেতরে এসো ।

কাঠের আসবাব দিয়ে সাজানো বসার ঘরটা । এদিকে একটা ঝার বাতি ঝুলে আছে উপর থেকে । দেয়ালে বাঁশের নকশা ।

কাঠের সোফায় গা এলিয়ে বসলাম । শিমলা বললো, রাস্তায় কোন অসুবিধা হয় নি তো ?

না । একটানে চলে এসেছি ।

শিমলা বললো,

ছুটির দিন বলে তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছে । আজ থেকে পনের বছর আগে হলে পারতে না । তখন ব্যাংকক শহরে গাড়ি নিয়ে বের হলে খুব মুশকিলে পড়তে হতো । এখন ফ্লাই ওভার করাতে ট্রাফিক কিছুটা কমেছে ।

একটু পরে শিমলার মা এলো, বললো, তোমার নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে । দুপুর তো গাড়িয়ে যাচ্ছে, চলো খেতে বসি ।

পার্শেই ঘের দিয়ে খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে । একজন বেয়ারা এসে দাঁড়ালো । বয়স বিশের উপরে নয় ।

শিমলা বললো,

আমরা সব ভেজিটেবল আইটেম করেছি । আশা করি তুমি Enjoy করবে । এই আইটেমগুলো আমি আর মা রুঁধেছি । তুমি নির্ভয়ে খেতে পারো ।

আমি বললাম, ঠিক আছে, অসুবিধে নেই । ধন্যবাদ ।

শিমলার মা বললো, তোমার দেশে কে কে আছে ?

বাবা-মা নেই । ভাই বোনেরা আছে । ওদের সব বিয়ে হয়ে গেছে ।

তাহলে তো তুমি একা পড়েছ । তোমার বয়সে আমিও বাবা-মা হারিয়ে ছিলাম ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

মালয়শিয়া তে কতদিন ধরে আছো ?

বছর তিনেক ।

খুব ভালো । প্লিজ খাবার তুলে নাও । শিমলা কে বললো, সাইদকে তুলে দাও ।

ধন্যবাদ, আমি নিজেই নিচ্ছি, এই বলে ভাত আর ফুলকফির ভাজি তুলে নিলাম ।

আমরা খেতে শুরু করেছি ।

শিমলার মা বললো, এখানে তোমার খাওয়ায় কষ্ট হচ্ছে না তো ?

প্রথম প্রথম হয়েছিলো পরে শিমলা ভাল হোটেল দেখিয়ে দেয় । ওখান থেকে কিনে খাই ।
একেবারে বাংলাদেশের মতন রান্না ।

তোমরা কি রান্নায় খুব Spice দাও, সাইদ ?

অনেকে দেয় । আমার মা দিতেন না । বলতেন যত টাটকা খাওয়া যায় ।

শিমলার মা বললেন, ধরতে গেলে আমরা কোন Spice দেই না । হালকা জ্বালে লবন দিয়ে সেদ্ধ
করে ফেলি ।

শিমলা বললো, খেতে পারছো তো সাইদ ?

আমি হেসে বললাম, কোন অসুবিধে দেখছি না । বাংলাদেশের রান্নার সাথে কোথায় যেন মিল ।

শিমলার মা বললো, দেশে যাওয়া পড়ে তোমার ?

এখন তো বাবা-মা নেই তাই যাওয়া হয় না । তবে মাঝে মধ্যে যাই ছুটি ছাটায় ।

খাওয়া শেষ করে চা নিয়ে বসেছি । তখনো বিকেল শুরু হয়নি । বাইরে সূর্যের আলো ম্লান হয়ে
এসেছে । আগের মতন টগবগে ভাবটা নেই । কেমন বিমিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে ।

শিমলা এসে পাশে বসলো ।

এই বার বলো আমার মা কে কেমন লাগলো ?

চমৎকার মহিলা । মনে হয় বাংলাদেশের কোন মা ।

শিমলা বললো,

আমরা এশিয়ানরা একই রকম । খুব একটা পার্থক্য চোখে পড়ে না । আমরা এদেশে অনেক
কিছু মানি যে গুলোর কোন ভিত্তি নেই । নিশ্চয় তোমরাও অনেক কিছু মেনে চলো ।

আমি হেসে বললাম,

সে সবেৰ কোন অভাব নেই বাংলাদেশে । যেমন, সকালে সকূলে বের হবার পথে ধাক্কা খেলে মা বলতেন, বাবু, একটু বসে যা । না হলে রাস্তায় বিপদ হতে পারে । আবার খেতে খেতে গলায় ঠেকে গেলে আমরা ভাবি কেউ বুঝি আমার কথা ভাবছে ।

শিমলা হেসে বললো, এ সবেৰ ঘটতি এ দেশেও তুমি পারে না ।

আমি বললাম,

ভাবছি আমরা এশিয়ানরা এক রকম হলাম কি করে ? পাশ্চাত্য বিশ্বের লোকজন কিন্তু এতো কিছু মেনে চলে না । কোথাও ধাক্কা খেলে একটু বসে যায় না । ওরা হেঁটে যায় । আমার মনে হয় এশিয়ানদের প্রচন্ড ধর্মীয় অনুভূতি আমাদের এক কাতারে াঁৱ করিয়ে দিয়েছে ।

আমার কথা শেষ হতে শিমলা বললো, দাঁড়াও, তোমার জন্য চা নিয়ে আসি । একটু বসো ।

আমি কিছু বললাম না ।

ধীরে ধীরে বেলা পরে আসছে । হালকা আলো ছায়া খেলা করছে সামনের বাগানে । আর এক ঘন্টার মধ্যে সূৰ্য ডুবে যাবে ।

শিমলা উঠে দাঁড়ালো । চল নদীতে ঘুরে আসি ।

কোথায় নদী ?

এই তো একটু পশ্চিমে । এই নদী ব্যাংককের প্রাণ । এর ধার ঘেঁষে গড়ে উঠেছে নগরী । চলো দেখবে ।

চলো, শিমলার পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলাম ।

চাও ফ্রেয়া নদী

ব্যাংকক শহর চিড়ে বয়ে গেছে চাও ফ্রেয়া নদী । এই নদীর পাড়ে গজিয়ে উঠেছে ব্যাংকক নগরী ।
কিছুদূর পর পর ব্রীজ, এই ব্রীজ দিয়ে দু-পারের যোগাযোগ রক্ষা হয় ।

অনেক পুরোনো এই চাও ফ্রেয়া । দেশের শিল্প, সাহিত্য আর সংস্কৃতির সাথে মিশে আছে এই নদী ।
নদীর দুই ধারে গড়ে উঠেছে ব্যবসা-বাণিজ্য, হোটেল-মোটেল ও আবাসিক ঘর-বাড়ি ।

নৌকা ভাড়া করে আনলো শিমলা । মাথার দিকটা চোঙা, দেখতে সাপের মতন, তিরতির করে বয়ে
চলে ।

উঠে বসো সাইদ ।

আমি মাঝে গিয়ে বসলাম । নৌকোর ধার ঘেষে বসেছে শিমলা । তখন সবে মাত্র সন্ধ্য নামছে । নদীর
ঘাটলয় আলো জ্বলতে শুরু করেছে । আমাদের নৌকা এগিয়ে চলেছে মাঝ-নদী বরাবর । ঠিক হয়েছে
ঘন্টা খানেক ঘুরে আবার ফিরে আসবো নদীর ঘাটলায় ।

তোমার শীত করছে, সাইদ ?

না ।

এখন শীত না করলেও ঘন্টা খানেক পরে করবে ।

তাই নাকি ?

হুঁ । সেজন্য বাসা থেকে চাদর এনেছি । শীত লাগলে বোলো ।

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম ।

দেখতে দেখতে নদীর মাঝে চলে এসেছি । ঘাটলার বাতিগুলো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে এলো । অন্ধকার
নেমে এসেছে নদী-বক্ষে । আকাশে আজ চাঁদ উঠেনি, তাই নক্ষত্রের আলো আরো ধারালো হয়ে উঠলো
। আমার মনে হলো হাজারো জোনাকি, হাজারো ফানুস হয়ে আকাশের নিভূতে আলো বিছিয়ে দিয়েছে
শিমলা বললো, তোমার সবচেয়ে কি ভাল লাগে ?

আমি হেসে বললাম, কেন ?

বল না শুনি ।

আমি বললাম,

সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছরে পড়া সমুদ্রের ঢেউ দেখতে ভাল লাগে । তখন মনে হয় এ
এক অচেনা পৃথিবী । পৃথিবীর মাঝেই আরেক পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়ে আছে ।

এই অচেনা পৃথিবীটা কি সাইদ ?

আমি হেসে বললাম,

যখন প্রতিটা আছরে পড়া ঢেউয়ের মধ্যে নূতন পৃথিবী দেখি, তখন আগের পৃথিবী পুরোনো
মনে হয় । মনে হয় খুব অচেনা ।

তোমরা কি সবাই এ রকম নাকি সাইদ ?

যেমন ।

শিমলা বলতে লাগলো,

তোমরা যেন কেমন উরুউরু, হাসিবকেও দেখেছি উরুউরু । হাসিবের সাথে থেকে শেষের দিকে
আমিও উরুউরু হয়ে গিয়েছিলাম ।

উরুউরুই থাকতে ?

শিমলা বললো,

আমার ক্যারিয়ার গড়ার শখ ছিলো তাই উডুউডু থেকে বেরিয়ে আসি কিন্তু মাঝে মাঝে মনের
ভেতর ডাক পড়লে তখন আবার উডুউডু হয়ে যাই । দু এক লাইন কবিতা লিখি তারপর মনে এসে
ভর করে ধানসিড়ির কথা । এই ধানসিড়িটা কি সাইদ ?

আমি চুপ হয়ে গেলাম । কি জবাব দেবো ভেবে পাচ্ছি না । বললাম,

আমি বলতে পারছি না । বরঞ্চ তুমি বাংলাদেশে ঘুরে যাও । আমাদের অনেক জীবনানন্দ
বিশেষণ্ড আছে, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে ।

যাবো নিশ্চয় যাবো । হাসিবের সাথে যেতাম কিন্তু ও তো বিয়ে থা করে আমেরিকা চলে গেলো ।

বাংলাদেশে গিয়ে কি দেখবে ?

শিমলা বলে উঠলো, ধানসিড়ি, গাঙচিল, নক্ষত্রের রাত, বিদর্ভ নগরী, বনলতা সেন, গভীর হাওয়ার রাত আর দারুচিনি দ্বীপ ।

আমি হেসে বললাম,

আদৌও এসবের অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ । বেশিরভাগি কবির কল্পনা তারপরেও তুমি চেষ্টা করতে পারো ।

সে চেষ্টা করতেই তো যাবো ।

আমি বললাম, তাহলে তো তোমার মধ্যে উডুউডু পুরোটাই আছে ?

শিমলা হেসে বললো,

আমাদের এই পুরো দেশটাই তো উডুউডু । তুমি দেখনা টেম্পলের পুরোহিতরা কেমন গেরুয়া পড়ে ঘুরে বেড়ায় । ঘর-সংসার ছেড়ে টেম্পলে পড়ে থাকে দিনের পর দিন । এদেরকে আমরা Monk বলি ।

হ্যাঁ রাস্তা ঘাটে প্রায় দেখি । টেম্পলে দেখেছি । এদের কাজটা কি শিমলা ?

নিজেকে পরিশুদ্ধ করা আর সেই পরিশুদ্ধ করতে নিজেরা গভীর সাধনায় মগ্ন থাকে । কোন মেয়েছেলে ওদের স্পর্শ করবে না । থাইবাসীরা Monk দের সম্মান করে চলে ।

একটু থেমে শিমলা আবার বলতে শুরু করলো,

এ দেশের জনসংখ্যার নব্বই ভাগ বৌদ্ধ মতে আছে । এদের সবাইকে জীবনের কোন না কোন এক সময়ে Monk হয়ে থাকতে হয় স্বপ্নকালের জন্য । আমাদের রাজা রামা নাইন কিছুকালের জন্য Monk হয়ে ছিলেন ।

আমি বললাম,

প্রাচীনকালে এই Monk রাই ছিলো পৃথিবির শিক্ষক । ভারতীয় Monk দের কাছে শিক্ষা নিতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসতো । অনেকে আবার ভারতে থেকে যেতো বছরের পর বছর ।

শিমলা বললো,

অনেকে বলে, বৌদ্ধ ধর্ম আসলে কোন ধর্ম নয় কারণ ধর্ম হতে গেলে অনেক কিছু লাগে যেমন, ঈশ্বর, স্বর্গ-নরক, দেব-দেবী কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে সে সবের বালাই নেই । এ হলো একটা জীবন-দর্শন । অহিংস পথে চলার পাথেয়, দুঃখময় জীবন থেকে পরিত্রাণের উপায় । যখনি তুমি নির্বাণ লাভ করলে, সকল দুঃখ থেকে মুক্তি পেলো ।

আমি বললাম, তুমি একটি ব্যাপার খেয়াল করেছে ?

কি ?

আমি বলতে লাগলাম,

বৌদ্ধ ধর্ম এমন একটা ধর্ম যা প্রতিষ্ঠা করতে কোন যুদ্ধের প্রয়োজন হয়নি । এমনি এমনি দাঁড়িয়ে গেছে । বর্তমান বিশ্বের বড় একটা অংশ এই বৌদ্ধ মতে আছে ।

এর কারণ কি জান সাইদ ? এর কারণ হলো বৌদ্ধ মতের সাথে অন্য ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসে কোন বিরোধ নেই তাই সব ধর্মের সাথে বৌদ্ধ দর্শন মানিয়ে চলতে পারে । দ্বিতীয়ত, বুদ্ধ ধর্মের মূলে যে অহিংস নীতি আছে, তা বৌদ্ধদের ধর্ম যুদ্ধে যেতে বার বার নিরুৎসাহিত করেছে ।

আমি বললাম, আসলে গৌতম বুদ্ধা কি বলতে চেয়েছেন ?

শিমলা হেসে বললো, কেন ? বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহন করবে নাকি ?

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

শিমলা বলতে শুরু করলো,

বুদ্ধ দর্শনের প্রথম কথা হলো মানব জীবন মাত্রই দুঃখময় আর সেই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করতে হবে । তুমি তো জানো গৌতম বুদ্ধ রাজার ছেলে ছিলো । সে দেখতো প্রাসাদের চারিপাশে বাস করা মানুষদের দুঃখ আর হাহাকার । মানুষদের এই দুঃখ গৌতম বুদ্ধকে তাড়িয়ে ফিরতো তাই এই দুঃখের কারণ আর প্রতিকার বের করতে তিনি প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন । এভাবে অনেক দিন কাটলো তারপর কোন এক পূর্ণিমা রজনীতে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন । যখন বুদ্ধত্ব এলো, মানুষের দুঃখের কারণ আর প্রতিকারের উপায় অজানা রইলো না ।

আমি বললাম, মানুষের দুঃখের কারণ কি ?

অঙতা । আমাদের অঙতা, লোভ, হিংসা সমস্ত দুঃখের কারণ ।

আমি বললাম, এইবার বলো এই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি ?

নির্বাণ । তোমাকে নির্বাণ লাভ করতে হবে তবেই দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে ।

এই নির্বাণটা কি ? আমি মাথা নেড়ে জানতে চাইলাম ।

এ এক জটিল ব্যাপার । আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না ।

তারপরেও চেষ্টা করে দেখো না ? আমি তাড়া দিলাম ।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো,

সম্ভবত নির্বাণ হলো একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি, যা ব্যক্ত করা যায় না। এটা উপলব্ধির ব্যাপার। সম্ভবত যিনি নির্বাণ লাভ করেছেন, তারপক্ষেও বলা সম্ভব হবে না তবে ভেতরে ভেতরে উপলব্ধি করা যাবে শত ভাগ, এই বলে শিমলা চুপ হয়ে গেলো।

আমি ডাকলাম, শিমলা।

হু। বলো।

চেষ্টা করে দেখো না নির্বাণের আরো কোন ব্যাখ্যা দিতে পারো কি না?

তুমি তো দেখছি নাছোরবান্দা?

বলতে পারো। এই স্বভাবটা আমার ছেলেবেলা থেকে, অর্ধেক শুনে শান্তি পাই না।

ঠিক আছে শোনো। এই আমি চেষ্টা করছি।

বলো।

শিমলা বলতে শুরু করলো,

নির্বাণ হলো মনের একটা অবস্থা বা বলতে পারো জ্ঞানের সর্বশেষ স্তর। এই স্তরে যখন তুমি পৌঁছলে, তোমার চারিপাশের ব্যাপার গুলো লুপ্ত হলো। তুমি গভীর আমানিষায় হারিয়ে গেলে ফলে দুঃখ, বেদনা, হতাশা, হিংসা তোমা থেকে মিলিয়ে গেলো। তুমি মুক্ত হয়ে গেলে সব কিছু থেকে, এই বলে শিমলা হেসে বললো, বাকীটা কোন Monk কে জিঙাসা করে নিও।

আমি বললাম, এই নির্বাণ লাভের জন্য আমাদের কি কি করতে হবে?

এক কথায় বলবো?

বলো।

শিমলা বলতে লাগলো,

নিজের অহংকে পরাভূত করতে হবে। লোভ, লালসা আর হিংসা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এর জন্য দরকার ঙান। জীবন চলার পথে ঙানকে করতে হবে নিত্যসাথী, দেখবে তুমি নির্বাণ লাভ করেছো। যখন নির্বাণ এলো, দেখবে তুমি আর তুমিতে নেই। অন্য সত্যায় হারিয়ে গেছো। এ এক দুঃখহীন, হতাশা মুক্ত স্বর্গ।

আমি হেসে বললাম, তোমাকে ধন্যবাদ এতো সব বলার জন্য। তুমি কি নির্বাণ লাভের চেষ্টা করো?

তা ঠিক করি না কারণ ব্যাপারটা জটিল আর এইটে অর্জনে অনেক ছাড় দিতে হয় তবে চেষ্টা করি অহিংস পথে চলবার যেন আমার দ্বারা কোন মানুষ বা প্রাণীর ক্ষতি না হয়।

আমি বললাম,

এই অহিংস পথটাই সবচেয়ে সেরা । ভারত উপমহাদেশে মহাত্মা গান্ধি এই অহিংসতার পথে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন ।

শিমলার কথাটাই ঠিক হলো । দেখতে দেখতে শীত এসে আকড়ে ধরলো । নদীর ঠান্ডা হাওয়ায় তাপমাত্রা নেমে এসেছে । শিশির পড়তে শুরু করেছে সারা নদী জুড়ে । ঘড়িতে দেখলাম রাত এগারটা । আমরা নদীর মাঝ দিয়ে বেয়ে চলেছি । কাল ছুটি ছাটা তাই বাড়ি ফিরবার তাড়া বোধ করছি না । শিমলা বললো, এই নাও চাদর । জড়িয়ে বসো, এই বলে ধূসর রঙের চাদর বাড়িয়ে দিলো ।

আমি হাতে নিতেই চাদরটা গড়িয়ে পড়লো আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে । কি মিহি করে বুনেছে ওরা । চাদরের চারিধারে কালো সুতোর কাজ । মাঝখানে গোলাকার ফুল । আমি হেসে বললাম, কই থেকে এনেছো ? এ যে মিহি ধানের চেয়েও নরম ।

ভারত থেকে এনেছে আমার বোন । ভারতীয়রা খুব ভালো হাতের কাজ জানে । দেখ না কি সুন্দর করে বুনেছে ?

আসলেই সুন্দর, এই বলে আমি কয়েকবার নেড়েচেড়ে দেখলাম ।

শিমলা বললো, বাংলাদেশ তো নদী নালার দেশ । তোমরা এভাবে নদীতে ঘুরে বেড়াও না ?

আমি বললাম,

সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ি । আমাদের নদীগুলো বিরাট বিরাট, বিশেষ করে বর্ষাকালে ওদের চেহারা পাল্টে যায় । কেমন যেন সাগরের রূপ নেয় । তখন ভয় ভয় লাগে । আবার শীতকালে ছোট হয়ে আসে, চুপসে যায় দুই পাড় । তারপর বললাম, একবার আসো না বাংলাদেশে ? বাংলাদেশের নদী, নালা, খাল, বিল তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাবো ।

যাবো, নিশ্চয় যাবো । জীবনানন্দ দাশের টানে হলেও যাবো । শিমলার কথা শেষ না হতেই আকাশে একটি তারা খসে পড়লো ।

শিমলা বললো, দেখেছো কেমন তারা খসে পড়ছে ?

আমি মাথা নেড়ে সাই দিলাম ।

ব্যাককের আকাশে প্রায় তারা ঝরে পড়ে । তোমাদের দেশে তারা ঝরে পড়তে দেখেছো ?

আমি বললাম, অনেক দেখেছি তবে গ্রাম দেশে বেশি দেখা যায় ।

বল না শুনি ?

ঠিক আছে শোনো, এই বলে আমি বলতে শুরু করলাম,

মাঝে মাঝে গ্রামের মাঠে বসতাম আমরা । সারারাত গল্প হতো । শীতকাল বলে ছোট্ট একটু আগুন জ্বালিয়ে নিতাম যেন শীতের প্রকোপটা কমে আসে । রাতভর শিশির পড়তো মাঠে । মোটা শক্ত চাদরে মাথা ঢেকে বসে থাকতাম আমরা । তখন দেখতাম তাড়া খসে পড়ছে আকাশ থেকে আমার কথা শেষ হতেই শিমলা বলে উঠলো,

হিমের রাতে শরীর উম রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা

সারারাত মাঠে আগুন জ্বলেছে -

মোরগফুলের মতো লাল আগুন ;

শুকনো অশথ পাতা দুমড়ে এখনো আগুন জ্বলছে তাদের ;

আমি বললাম, জীবনানন্দ দাশ থেকে বললে ?

হু, বলে শিমলা চুপ হয়ে গেলো ।

রাত অনেক হয়ে এলো । শিমলার গাড়িটা আমাকে হোটেলের মুখে নামিয়ে ফিরে গেছে । আমি সিঁড়ি বেয়ে হোটেলের লবিতে উঠছি আর ভাবছি শিমলার কথা, এক ভিনদেশী মেয়ের কথা যার সারা অন্তর জুড়ে বাংলাদেশের এক কবি ছায়া ফেলে রেখেছে ।

Chulalongkorn University

ব্যংককের মাঝেই এই Chulalongkorn ইউনিভার্সিটি । রাজা Chulalongkorn এর নামে এই ইউনিভার্সিটি করা । রাজা Chulalongkorn রামা-ফাইব নামে পরিচিত । অনেক গুলো ফ্যাকাল্টি আছে Chulalongkorn এ । আমার হোটেল থেকে গাড়ি চালিয়ে অনায়েসে পৌঁছে যাই ইউনিভার্সিটিতে ।

এই Chulalongkorn এ পড়াতে এসেছি তিন মাসের জন্য । দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেলো । আজ শেষ ক্লাস, এর পর আর আসা হবে না । আগামী সপ্তাহে মালয়শিয়া ফিরে যাচ্ছি । Monetary Economics এর শেষ চ্যাপ্টার টা পড়লাম আজ । পড়ানো শেষ হয়েছে, এক ছেলে উঠে দাঁড়ালো । বিনয়ের সাথে বললো,

তুমি তো চলে যাচ্ছ । যাবার আগে আমাদের কিছু বলো ?

কি জানতে চাও ?

যা ইচ্ছে ।

আমি অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললাম, তোমরা যদি specific কোন বিষয়ে জানতে চাইতে, আমার জন্য সুবিধে হতো ।

তখন এক মেয়ে দাঁড়িয়ে বললো, তোমার দেশ নিয়ে কিছু বলো ?

বাংলাদেশ নিয়ে ?

হু ।

কি জানতে চাও ?

বাংলাদেশের সীমানা, অবস্থান এই সব ?

ঠিক আছে, এই বলে বলতে শুরু করলাম,

বাংলাদেশ হলো দক্ষিণ এশিয়ার এক দেশ। ছোট্ট দেশ অথচ মানুষ দিয়ে ঠাসা আর সেটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। কোন ভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঠেকিয়ে দেয়া যাচ্ছে না। ঢাকায় এলে দেখবে কেমন মানুষে ভরা, এই বলে থেমে গেলাম।

তারপর আবার বলতে শুরু করলাম,

বাংলাদেশের তিন পাশ জুড়ে আছে ভারত। দক্ষিণে বয়ে চলেছে বঙ্গোপসাগর। যেহেতু ভারত আমাদের সীমান্তে দাঁড়িয়ে, তাই ভারতের সাথে আমাদের ভাগ্য নানা ভাবে জড়িয়ে আছে। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের আবাস এই ভারতে।

ভারত তো পরমাণু শক্তিদ্রও? একজন বলে উঠলো।

হুঁ। আমি মাথা নেড়ে সাই দিলাম। বললাম, ভারত একা নয়, পাকিস্তানও পরমাণুর খাতায় নাম লিখিয়েছে।

ছেলেটা বললো, চির শত্রু দুই দেশের মধ্যে পরমাণুর যুদ্ধ বাধলে উপমহাদেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, কি বলো?

আমি বললাম,

মনে হয় না নূতন করে যুদ্ধ বাধবে কারণ ওরা জানে পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা। তবে সত্যি সত্যি যদি যুদ্ধ বেধে যায়, পরমাণুর আঙুনে জ্বলে পুরে ছাই হয়ে যাবো আমরা। মুছে যাবে ভারত উপমহাদেশের নাম পৃথিবির মানচিত্র থেকে।

তোমরা SAARC এর মাধ্যমে একটা সুরাহা করতে পারো না?

আমি হেসে বললাম, না, SAARC সেই পর্যায়ে নেই।

কেন বলো তো?

আমি বলতে শুরু করলাম,

SAARC হয়েছে অনেক বছর হলো কিন্তু তার সুফল আজও আসে নি। SAARC এগুতে পারছে না নানা কারণে। যেমন : ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে কাস্মির ইস্যু নিয়ে জিইয়ে থাকা বৈরি ভাব, সদস্য দেশ গুলোর মধ্যে পারস্পারিক আস্থার অভাব আর আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অস্থিীলতা, SAARC কে স্থবির করে রেখেছে। তবে চেষ্টা চলছে কিভাবে এই SAARC কে কার্যকরি করা যায়।

নিজেদের মধ্যে এই আস্থা ফিরিয়ে আনতে তোমরা কি কি ব্যবস্থা নিয়েছো ?

আমি বলতে শুরু করলাম,

পারম্পারিক আস্থা ফিরিয়ে আনা চারটি খানি কথা নয় । এই অনাস্থার ভিত্তিতে অনেক গভীরে তারপরেও চেষ্টা চলছে । সদস্য দেশ গুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক দলের আদান-প্রদান, আন্তর্দেশীয় খেলাধুলা, সড়ক পথে যাতায়াত, এসবের মধ্যে দিয়ে সম্পর্ক জিইয়ে রাখার চেষ্টা চলছে । তবে যতদিন না পর্যন্ত রাজনৈতিক সদিচ্ছাটা জাগবে, ততদিন SAARC মুখ খুবড়ে পড়ে থাকবে ।

এক মেয়ে বলে উঠলো,

সম্ভবত এই শক্ত কাজটি করার দায়িত্ব শক্তিশ্বর দুই দেশ ভারত আর পাকিস্তানের উপরে বর্তায় । যেমন : ইউরোপিয় ইউনিয়নের কথাই ধরো না । ফ্রান্স আর জার্মানী, শক্তিশ্বর এই দুই দেশ ইউরোপিয় ইউনিয়নে একত্র বজায় রেখেছে । মুরক্কীরা যদি মিলেমিশে থাকে, পরিবারে শান্তি আসবে সেটাই স্বাভাবিক ।

আমি কিছু বললাম না ।

এক মেয়ে বললো, আমাদের এই আসিয়ানের কোন দুর্বলতা তোমার চোখে পড়েছে ?

আমি বললাম,

এদের সবচেয়ে বড় অসুবিধে হলো, আসিয়ানদের কেউ গনতন্ত্রমনা, কেউবা সামরিক জাঙ্গা আবার অনেকে রাজা-বাদশাহ । এই ভিন্ন মতের কারণে আসিয়ানদের অনেক অসুবিধেয় পড়তে হয় ।

এক ছাত্র দাঁড়িয়ে বললো,

এর পাশাপাশি রয়েছে ধর্মের বিভেদ । কেউ খ্রিস্টান, কেউবা মুসলিম আবার অনেকে বৌদ্ধ । এই ধর্মের বিভিন্নতা একটা বাধা । ইউরোপিও ইউনিয়নে সদস্য রাষ্ট্রগুলো সবাই খ্রিস্টান । এই ধর্মীয় একাত্মতা অনেক মত পার্থক্য দূর করতে সাহায্য করে ইউরোপিওদের ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

একটা শূকনো মতন ছেলে বললো,

এবার গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে কিছু বলো ?

আমি বলতে শুরু করলাম,

গ্রামীণ ব্যাংক মূলত দরিদ্র পল্লিবাসীর ব্যাংক । এই ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে কোন বন্ধকের প্রয়োজন পড়ে না । অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বন্ধক ছাড়া ঋণ দিতে চায় না ফলে যাদের

সহায়-সম্পত্তি নেই, তারা ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে না ফলে গরিব গরিবই থেকে যায়। এই গ্রামীণ ব্যাংক গরিব মানুষদের পুঁজি দিয়ে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে সাহায্য করেছে।

এই গ্রামীণ ব্যাংক আদলে আরো ব্যাংক গড়ে তোলা যায় না? কেউ একজন পাশ থেকে জানতে চাইলো।

আমি বললাম,

পৃথিবির অনেক দেশেই গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে ব্যাংক গড়ে তোলা হয়েছে। যেমন, মালয়শিয়াতে আছে আমানাহ ইখতিয়ার। আরো নূতন নূতন দেশ এগিয়ে আসছে এই আদলে ব্যাংক গড়ে তুলবার জন্য।

একজন বললো, তোমাদের দেশের দারিদ্রতার অবস্থা এখন কেমন?

আমি বললাম,

আমরা এখনো গরিব তবে আগের থেকে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। না খেয়ে থাকে, এ রকম লোক পাবে না বাংলাদেশে। এর প্রধান কারণ হলো বাংলাদেশের কৃষকেরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে শিখেছে ফলে খাদ্য ঘাটতি মিলিয়ে একটা ভারসাম্য চলে এসেছে। বলতে পারো বাংলাদেশ এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্য সংস্থানের পাশাপাশি সরকারি এবং এনজিও সহায়তায় পল্লী অঞ্চলে স্কুল, মাতৃসদন ও চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ফলে জীবন যাত্রার সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে গত বছর গুলোতে।

একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে বললো, তাহলে কি আমরা ধরে নেবো বাংলাদেশ দারিদ্রতা থেকে বেরিয়ে উন্নয়নের দিকে এগুচ্ছে?

আমি হেসে বললাম,

আমি ঠিক তা বলি নি। বাংলাদেশ এখনো বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ। অনেক অভাবী লোক আজও চোখে পড়বে বাংলাদেশে তবে কথা হলো, মৌলিক চাহিদা যেমন অন্ন, বস্ত্র আর বাসস্থানের একটা হিল্লো কম বেশি সকলেরি হয়েছে। না খেয়ে কেউ কাটায় না। আর উন্নয়নের কথা যদি বলো, সেক্ষেত্রে অনেক ধনাত্মক পরিবর্তন এসছে গত দশ বছরে। ব্যবসা-বাণিজ্যের চাকা ঘুরছে জোরেশোরাই। শিল্পের প্রসার ঘটেছে, কর্মসংস্থান বেড়েছে। তবে দারিদ্র চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে ঠিক যতটুকু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দরকার, তা এখনও অর্জিত হয় নি।

ঠিক কতটুকু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলে তোমরা দারিদ্রের চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে?

আমি চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ তারপর বললাম, কোন ভাবেই সাত শতাংশের নিচে না, এর উপরে হলে ভালো ।

এই সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি পেতে চাই অনেক পুঁজি । এই পুঁজির হদিস কোথায় পাবে ? এক মেয়ে জানতে চাইলো ।

আমি বললাম,

এই পুঁজির অভাবে দরিদ্র মানুষেরা যেমন ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে পারে না, তেমনি সমগ্র দেশ পুঁজির স্বল্পতায় একটা নির্দিষ্ট দরিদ্র চক্রে আটকে আছে । আমাদের দেশের মানুষের হাতে ওত পুঁজি নেই যা দিয়ে সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি সম্ভব, তাই বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভর করতেই হচ্ছে । একটু ছাড় দিয়ে হলেও বৈদেশিক বিনিয়োগ আনতে হবে । বৈদেশিক বিনিয়োগ শুধু অর্থ নিয়ে আসে না, এর সাথে চলে আসে প্রযুক্তি আর উচ্চ ব্যবস্থাপনা ফলে দেশীয় লোকেরা অনেক কিছু শিখতে পারে বিদেশীদের কাছ থেকে । এই আসিয়ানদের কথাই ধরো না । বিদেশী পুঁজি আসিয়ানদের ভাগ্য পরিবর্তনে সাহায্য করেছে ব্যাপক পরিসরে ।

কিছুক্ষণ নিরব থেকে আবার বলতে শুরু করলাম, বিদেশী পুঁজির পাশাপাশি আরেকটা কাজ করতে হবে আর তা হলো শিক্ষা খাতে বিপুল বিনিয়োগ । একমাত্র শিক্ষিত জনগোষ্ঠি পারে দেশকে আঁস্কাকুড় থেকে তুলে আনতে । আসিয়ানদের মধ্যে যারা শিক্ষা খাতে সব চেয়ে বেশি বরাদ্দ দিয়েছে, তারাই তাড়াতাড়ি এগিয়েছে । মালয়শিয়া হলো একটা উদাহরণ । শিক্ষা খাতে বিপুল বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশী পুঁজি এ দেশের ভাগ্যকে রাতারাতি পালটে দিয়েছে অথচ বিশ বছর আগে এরা ছিলো কৃষির উপর দাঁড়িয়ে । একজন দাঁড়িয়ে বললো,

শিক্ষা আর বিদেশী পুঁজির পাশাপাশি নিরবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আর মজবুত নেতৃত্ব মালয়শিয়াকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে শক্ত ভিতের উপরে । শিক্ষা খাতে ওদের বিনিয়োগ সত্যি অনেক ব্যাপক ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম । দেখলাম অনেকেই মাথা নাড়ছে ।

একজন বললো, তোমাদের দেশের সমস্যাগুলো তোমরা চিহ্নিত করতে পেরেছো ?

আমি বললাম,

আমাদের সমস্যার শেষ নেই। রাজনীতিতে দুর্নীতি, ভালো ও শিক্ষিত মানুষদের রাজনীতিতে অনিহা, স্বল্প শিক্ষার হার, অল্পতে তুষ্টি, ভূমির তুলনায় অধিক জনসংখ্যা আমাদের খুবড়ে খুবড়ে খাচ্ছে।

অল্পতে তুষ্টি এর মানে কি? এক মেয়ে পাশ থেকে বললো।

আমি হেসে বললাম,

বাংলাদেশের পাড়া গায়ে গিয়ে দেখবে মানুষের চাহিদা খুব কম। আজ আর কালের খাবার যোগান থাকলে ওরা ঘরে বসে থাকে তারপর যখন খাবার ফুরিয়ে যায় তখন আবার কাজে নামে। কিন্তু এ মন মানসিকতায় জীবন যাত্রার মান পরিবর্তন করা যায় না। জীবন যাত্রার মান বাড়াতে প্রতিটি মানুষকে উচ্চাভিলাষি হতে হবে। নূতন নূতন কর্মের ক্ষেত্র খুঁজে বেড় করতে হবে তবেই ধনাত্মক প্রভাব পড়বে দেশের উপরে। এই উচ্চাভিলাষি হওয়া খারাপ কিছু নয়। তুমি সং উপায়ে গা-গতর খাটিয়ে টাকা আয় করবে, তাতে তুমি যেমন লাভবান হবে, তেমনি বেকার সমস্যার একটা হিল্লি হবে। তখন এক মেয়ে দাঁড়িয়ে বললো,

আমার মনে হয় তোমার এই কথাটা সবচেয়ে বেশি খাটে Singapore এর জন্য। এই Singaporean রা খুব উচ্চাভিলাষি এবং সেই লক্ষ্যে রাত দিন খাটে ওরা। ফলে তৈরি হয়েছে নূতন নূতন কর্মক্ষেত্র আর উপায়। বিশ্ব মানের এয়ারলাইন্স, টেলি-কমিনিউকেশন, হেলথ এ্যান্ড এডুকেশন সার্ভিস ওরা গড়ে তুলেছে অথচ ত্রিশ বছর আগে ওরা ছিলো অনুন্নত সমুদ্র এলাকা। জীবন যাত্রার মান সূচকে Singapore আজ ইউরোপিও মানের তালিকায়, এই বলে মেয়েটা থেমে গেলো। তখন পাশ থেকে একজন সায় দিয়ে বললো,

এই উচ্চাভিলাষি মনোভাবের কারণে ঐ দেশের সামাজিক সূচকে কোন ঋনাত্মক প্রভাব পরেনি। সিঙাপুর হলো বিশ্বের অন্যতম দুর্নীতি মুক্ত দেশ। অফিস, আদালত ও পুলিশ ডিপার্টমেন্টে দুর্নীতি নেই বললেই চলে।

আমি চুপ হয়ে গেলাম। কিছু বললাম না।

এক মেয়ে বললো, বাংলাদেশ কি এখনো কৃষির উপর দাঁড়িয়ে?

আমি বললাম,

বাংলাদেশ এখনও কৃষির উপর দাঁড়িয়ে তবে অর্থনীতিতে কৃষির ভাগ ক্রমান্বয়ে কমে আসছে এবং শিল্পের অবদান বাড়ছে। এইটে খারাপ কিছু নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে কৃষির ভাগ

কমবে, এটাই স্বাভাবিক । উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে দেখবে কৃষির অবদান অর্থনীতিতে পাঁচ ভাগেরও কম । কৃষি থেকে লাভ সামান্যই হয় তাই উন্নত দেশগুলো কৃষি থেকে বেরিয়ে গান নির্ভর অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছে ।

একজন পাশ থেকে বললো, এই গান নির্ভর অর্থনীতিটা কি?

আমি একটু থেমে বলতে শুরু করলাম,

তিন ধরনের অর্থনীতি হতে পারে । কৃষি নির্ভর, শিল্প নির্ভর আর গান নির্ভর বা নলেজ ইকোনমি । পাশ্চাত্য বিশ্ব এখন সম্পূর্ণ গান নির্ভর । গান নির্ভর অর্থনীতিতে তৈরি হয় সব গান-সামগ্রী যেমন, সফটওয়্যার, টেলিকমুনিকেশন ইত্যাদি । এই সব গান-সামগ্রী বেঁচে সবচেয়ে বেশি লাভ করা যায় তাই উন্নত দেশগুলো গান-সামগ্রী তৈরির সুবাদে বিশ্ব আয়ের আশি ভাগ নিজেদের ঘরে তুলে আনতে পেরেছে ।

কেউ একজন বললো, তাহলে আমরা কেন গান-সামগ্রী তৈরি করি না ?

আমি বললাম,

এই সব গান-সামগ্রী তৈরি করতে অনেক গান বা knowledge worker দরকার যা আমাদের নেই ফলে হয় আমরা কৃষি-সামগ্রী অথবা শিল্প দ্রব্য তৈরি করি যা থেকে মাঝারি আয় হয় । আসিয়ানদের মধ্যে একমাত্র সিঙাপুর ক্রমান্বয়ে নলেজ ইকোনোমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কারণ ওদের আছে নলেজ ওয়ার্কার । সাধারণত inventor আর innovator দের নলেজ ওয়ার্কার বলা হয় ।

দেশকে গান বা নলেজ ইকোনোমিতে রূপান্তরিত করতে কি কি করতে হবে ?

আমি চুপ হয়ে গেলাম । তারপর বললাম,

এক কথায় বলতে গেলে, Information and Communication Technology দিয়ে দেশ মুড়ে ফেলতে হবে যেমন, ইন্টারনেট, মোবাইল, টেলিফোন ইত্যাদি । এই কাজটি করতে হবে যেন দেশের মানুষ সকল ধরনের তথ্য পেতে পারে । আজকের এই নলেজ জুগে তথ্যই হলো হাতিয়ার যা দিয়ে ভাগ্য ফিরিয়ে আনা যায় । এর পাশাপাশি শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বিপুল বিনিয়োগ, মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং, দেশের মানুষের মধ্যে গান-বিগান চর্চার উৎসাহ, দেশের মনিটারি, বিচার, নির্বাচন আর দুর্নীতি দমনের মতন ইন্সটিটিউশন গুলোকে স্বায়ত্ত্ব শাসন দিতে হবে পুরোপুরি । এর পাশাপাশি চাই অবাধ তথ্য প্রবাহের সুযোগ । উন্নত দেশ বা গান নির্ভর দেশগুলোর দিকে তাকালে এই সব বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবে ।

আগামী দশকে বাংলাদেশ কেমন যাবে ?

আমি তো সব রকমের আশা দেখি । কেন জানি মনে হয় আমরা দারিদ্র চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো ।

এক মেয়ে দাঁড়িয়ে বললো,

তোমরা চেষ্টা করতে পারো আসিয়ান পরিবারে সদস্য হবার । তাহলে স্বল্প শুল্ক আসিয়ান পরিবারে যে ব্যবসা বাণিজ্য চলে, তার সুফল ভোগ করতে পারবে ।

আমি হেসে বললাম, সে চেষ্টা আমাদের আছে । আসিয়ান পরিবারে ঢুকতে পারলে আমাদের লাভ বই কি ক্ষতি হবে না ।

পাশ থেকে একজন বললো, তোমার জীবনে স্মরণীয় ঘটনা কি ?

আমি হেসে দিলাম । প্লিজ একটু সময় দাও, আমি ভেবে নেই, এই বলে আমি চুপ হয়ে গেলাম । তারপর বললাম,

হ্যাঁ মনে পড়েছে । তোমরা তো জানো বাংলাদেশ নদী নালার দেশ, বর্ষাকালে প্রায়ই বন্যা হয় । ১৯৮৮ সালের বন্যা খুব ভয়াবহ হয়েছিলো । তখন আমি ঢাকায় থাকি । বন্যার কারণে নদীর পানি বাড়তে লাগলো । এক সময় সেই পানি শহরে এলো । তারপর কদিন যেতে না যেতে পানি উঠে এলো আমাদের ঘরে । উপায়ন্তর না দেখে আমরা দোতলায় উঠে গেলাম । নিচ তলায় ডুবে রইলো বন্যার পানিতে । কিন্তু সমস্যা সেখানেই ফুরুলো না । আমার মা গরু পালতেন, বাড়ির উঠানে ওদের থাকবার জায়গা । সেখানেও পানি ঢুকলো ফলে গরু গুলোকেও দোতলায় তুলে আনা হলো তারপর গরু আর আমরা পাশাপাশি থাকতে শুরু করলাম ।

সবাই হেসে উঠলো । মেয়েরা বেশি করে হাসলো । আমিও হাসলাম ওদের সাথে । মনে এসে ভর করলো শিমলার কথা । ও থাকলে আমাদের এই আড্ডা উপভোগ করতে পারতো ।

দেখতে দেখতে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেলো । লাঞ্চ আওয়ার ঘনিয়ে এসেছে । একজন দাঁড়িয়ে বললো, তুমি নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছো আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে । এইটে আমাদের শেষ প্রশ্ন ।

বেশ করো, আমি হাসি মুখে বললাম ।

তোমার থাইল্যান্ডে কেমন লাগলো ?

আমি অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

এ দেশের মহামানব গৌতম বুদ্ধের যে অহিংস নীতি আছে, সেইটে সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার। অহিংস দর্শনের মূলে যে লক্ষ্য লুক্কায়িত আছে, তা বিশ্বে শান্তি আনতে দেরি করবে না। এ এক পরম সত্য, পরম পছন্দনীয় জিনিষ।

আমার কথা শুনে সবাই দাঁড়িয়ে গেলো তারপর হাততালি দিতে লাগলো। সবাই বলে উঠলো, তোমার যাত্রা শুভ হোক। আবার এসো, তোমার কথা আমাদের মনে থাকবে।

তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে আমাকে উপহার দেয়া হলো। খুলে দেখি রামা নাইনের ছবি, কাসার ফ্রেমে বাঁধানো।

সকালের বৃষ্টি

আজ রবিবার, ছুটি ছাটা । সকাল থেকে বুর বুরে বৃষ্টি । ভালো করে লেপ কাথা চাপিয়ে নিয়েছি ।
কখন যে বেলা নটা ছুঁয়েছে, খেয়াল করিনি ।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো । ঘুমের মাঝে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছি । অলস হাতটা গিয়ে পড়লো ফোনের
ক্রাডলে । ঘুম জড়িত কণ্ঠে বললাম, গুড মর্নিং । সাইদ বলছি ।

ওপার থেকে মিষ্টি কণ্ঠ । Good morning Sir, শিমলা বলছি ।

আমি উঠে বসলাম ।

তোমাকে না কতদিন বলেছি আমাকে স্যার বলবে না, কেমন অস্বস্তি লাগে ।

তুমি না চাইলেও পারছি না কারণ এখন official duty তে আছি আর তুমি আমাদের
সম্মানিত অতিথি । হোটেলের বাইরে যত ইচ্ছে অনুরোধ করো ।

আমি আর কথা বাড়লাম না । চুপ হয়ে গেলাম ।

শিমলা বললো, তুমি নিশ্চয় সকালের নাস্তা করোনি ?

না ।

অসুবিধে না থাকে তো আমার অফিসে চলে আস । এক সাথে Breakfast সারি । কদিন পর তো
চলেই যাচ্ছ ।

আসছি, এই বলে ফোন রেখে দিলাম ।

শাওয়ার সেরে ইঞ্জি করা পোশাক পড়ে নিয়েছি তারপর লিফট দিয়ে নিচে নেমে এলাম । চার তলায় শিমলার অফিস । মাঝারি সাইজের হলুদ প্লেটে লেখা,

Shimla Acharzo,

Executive Manager (Operational and Accounts).

অফিসের মুখে শিমলার সেক্রেটারি । আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো । বললো, সোজা চলে যাও । ম্যাডাম অপেক্ষা করছে ।

আমি হনহন করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম । ঘরটা যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া, সারা মেঝে জুড়ে নীল কার্পেট । স্তরে স্তরে কাঠের আলমারি । দরজার মুখে পাতা বাহারের গাছ, দক্ষিণের জানালা গলিয়ে সকালের আলো এসে পড়ছে সেই গাছে । তাকিয়ে দেখলাম বুর-বুরে বৃষ্টির ভাবটা মিলিয়ে যাচ্ছে, ফর্সা হয়ে আসছে আকাশ । সূর্য মাঝে কিছুক্ষণের মধ্যে ধরা দেবে ব্যাংককের আকাশে ।

শিমলা তার প্রসস্ত টেবিল ছেড়ে উঠে এলো । প্লিজ বসো, এই বলে হালকা করে হাসলো মেয়েটা ।

পার্শেই সোফা সাজানো আছে । আমি এলিয়ে বসলাম ।

শিমলা বললো, কেমন আছো ?

ভালো ।

আমি মনে হয় তোমার সকালের ঘুমটা মাটি করে দিলাম ?

আমি হেসে বললাম, কোন থাই সুন্দরীর সাথে সকালের Breakfast করবো, সে তো হাজার ঘুমের চেয়ে উত্তম ।

শিমলা হেসে দিলো । আমি তাকিয়ে দেখলাম, শিশিরে শিশিরে ভরে গেল ঘরটা ।

দেখতে দেখতে Breakfast চলে এসেছে । দুই মাঝ-বয়সি মেয়ে ট্রেতে Breakfast নিয়ে হাজির ।

একে একে সেগুলো রাখা হলো টেবিলের উপর ।

শিমলা বললো, তোমাদের ধন্যবাদ, কিছু লাগলে জানাবো । তোমরা চাইলে যেতে পারো ।

ধন্যবাদ ম্যাডাম, এই বলে মেয়ে দুইটা চলে গেলো ।

শিমলা একটা প্লেটে আমার খাবার বাড়তে লাগলো ।

আমি বললাম, আর দিও না । একদম খেতে পারবো না ।

ঠিক আছে । এটুকুন তো খাবে ?

তাও পারবো না ম্যাডাম ।

শিমলা কিছুটা নামিয়ে প্লেটটা বাড়িয়ে দিলো ।

খেতে বসেছি দুজন । তাকিয়ে দেখলাম শিমলার প্লেটের এক কোণায় এক স্লাইস ব্রেড পড়ে আছে, সাথে হালকা মাখন ।

আমি বললাম, তুমি তো কিছুই নাওনি ?

আমি এটুকুই খাই । এর বেশি চাইলেও খেতে পারবো না ।

এ টুকুন খেয়ে সারাদিন অফিস করতে পারবে ?

আমার অভ্যেস আছে ।

আমি হেসে দিলাম, কিছু বললাম না ।

শিমলা বললো, হাসিবের ছবি দেখবে ?

দেখাও ।

ড্রয়ের থেকে ছবি বের করে আনলো শিমলা । বললো, হাসিবকে তোমার কথা বলেছি E-mail এ ।

সে তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ।

আমার শুভেচ্ছা পৌঁছে দিও হাসিবকে ।

এই দেখো হাসিব আখতার আর এইটে ওর wife । বউটা কি সুন্দরী, তাই না ?

আমি হেসে বললাম, নিশ্চয় সুন্দরী তবে সুকুম্ভিত রোডের শিমলা আচার্যের চেয়ে এক ধাপ পিছিয়ে ।

শিমলা সে দিকে না গিয়ে বললো, এই দেখো ওদের দুই বছরের মেয়ে ।

বাহ, মেয়েটা তো খুব সুন্দর ।

ইয়েস খুব সুন্দর । হাসিবের ইচ্ছে মেয়েকে টিচার বানাবে । দেখেছো হাসিব কেমন মুটিয়ে গেছে । বউয়ের যত্ন-আত্মা পেয়ে শরীরে মেদ এসেছে । কেমন যেন আলসেটে ভাব ওর চেহায়ায় ।

কৈ তুমি তো নিচ্ছ না, সাইদ ?

এই তো নিচ্ছি, এই বলে ব্রেড তুলে নিলাম ।

শিমলা বললো, তোমার তো যাবার দিন ঘনিয়ে এলো ।
হু আর মাত্র এক সপ্তাহ তারপর রামাদের দেশ ছাড়ছি ।
না ছাড়লেই পারো । এখানে তো চাকরির অভাব নেই ।
আমি বললাম,

Chulalongkorn University গতকাল আফার দিয়েছে তিন বছরের জন্য । ইচ্ছে হলে
থেকে যাওয়া যায় । এখনো তো রামাদের জানা হলো না ।

তাহলে থেকে যাও, শিমলা তাড়া দিয়ে বললো ।
আমি বললাম,

এই রামাদের আদি-উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কর্মকান্ড নিয়ে বড় ধরনের গবেষণার ইচ্ছে ছিলো কিন্তু
তা মনে হয় হলো না । বর্তমান রাজা রামা নাইন নিয়ে তোমাদের অবস্থান কি ?
শিমলা বলতে শুরু করলো,

রামা নাইন একজন শিক্ষিত রাজা সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম সময়ের রাজা । দেশের
কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন । নিজের গাট থেকে টাকা খরচ করে গরিব
থাইদের জন্য । এ দেশে রামা নাইন খুব জনপ্রিয় । রাজা পাশ দিয়ে গেলে সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে বসে
পড়ে । গৌতম বুদ্ধের পরেই রামা নাইনের স্থান ।

তাহলে তো দেখছি এ এক ইলাহি কান্ড । আফসোস, এই রামাদের খালি চোখে দেখা হলো না ।
তোমাদের দেশে রাজা বাদশাহ নেই ?

আগে ছিলো, অনেক আগে । এখন ও সবের বালাই নেই ।

তোমাদের মালয়শিয়াতে ?

হ্যাঁ আছে । রাজা আছেন তবে ওখানকার রাজার ব্যাপারটা একদমি অন্য রকম ।

সেটা কি রকম ?

আমি বলতে শুরু করলাম,

মালয়শিয়াতে রাজার ছেলে রাজা হয় না । ওদেশের সুলতানেরা পালাক্রমে রাজা হয় ।
অনেকগুলো স্টেটস নিয়ে মালয়শিয়া । সেই স্টেটসে একজন করে সুলতান থাকেন ওরাই পালাক্রমে
রাজা হয় । সাংবিধানিক ভাবে রাজার ক্ষমতা নেই বললেই চলে তবে রাজা কোন অনুরোধ করলে সেটা
মেনে চলা হয় । সারা দেশের মানুষ রাজাকে সম্মান করে । তোমাদের দেশের রামা নাইন যেমন
রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে না, মালয়শিয়ার রাজারাও তাই ।

শিমলা বললো,

তাহলে তো মালয়শিয়ায় রাজা হবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা । থাইল্যান্ডে রাজ পরিবারের বাইরে কেউ রাজা হবে, তা ভাবাই যায় না । বাঁধাছাঁদা করে ফেলেছো ?

বলতে পারো এক রকম শেষ । শুধু একটা সুটকেস কিনবো । সব আঁটাতে পারছি না ।

তুমি তো চলে যাচ্ছ । যাবার আগে একটা কথা শুনে যাও ।

ঠিক আছে বলো ।

তোমার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে যা সবার আগে চোখে পড়বে ।

সেটা কি রকম ? আমি মাথা ঝুকে জানতে চাইলাম ।

সত্যি সত্যি শুনতে চাও ?

হু শুনতে চাই ।

শিমলা বলতে লাগলো,

কেউ যখন কথা বলে, তুমি মন দিয়ে কথাটা শোনো তারপর ভালো করে বুঝে জবাবটা দাও ।

যতবার আমি কথা বলেছি, তুমি মন দিয়ে শুনেছো তারপর উত্তরটা দিয়েছো ।

আমি বললাম, তাহলে তো দেখছি আমি একজন ভালো Listener ।

ঠিক তাই, এই বলে আমার গ্লাসে পানি ঢেলে দিলো শিমলা । বললো, থাই সমাজে ধীর স্থির মানুষের

কদর আছে কারণ বৌদ্ধ দর্শনে বার বার Tolerance এর কথা বলা হয়েছে । তুমি খেয়াল করলে

দেখবে এ দেশের Monk রা তাদের Tolerance বাড়ানোর জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে চলেন । যার

যতো Tolerance, সে তত ত্বরিত নির্বাণের দিকে এগিয়ে যাবে ।

আমি বললাম, তাহলে কি আমি নির্বাণের দিকে এগিয়ে চলেছি ?

শিমলা হেসে দিলো । অনেকক্ষণ ধরে হাসলো মেয়েটা । হাসি থামিয়ে বললো, তোমাকে আরও এক

কাপ কফি দেবো ?

ঠিক আছে দাও ।

শিমলা উঠে গেলো । অনেক সময় নিয়ে কফি বানালো । হালকা ধূয়া উড়ছে, ক্যাফিনের মিষ্টি গন্ধ

ছড়িয়ে পড়লো চারিপাশে ।

আমি বললাম, বাংলাদেশের কবিদের নিয়ে তো অনেক গল্প বললে । এবার এ দেশের কবিদের গল্প

বলো ।

এ দেশের কবিদের গল্প ?

হু, বলে আমি মাথা নাড়লাম ।

কি ধরনের গল্প শুনতে চাও ?

তোমার যে রকম ইচ্ছে ।

শিমলা বলতে লাগলো,

ঠিক আছে বলছি । ওর নাম লা-সাও । ক্ষেতখোলা, অমাবস্যা আর অন্ধকার রাত্রি নিয়ে কবিতা লেখে এই লা-সাও । তেমন পরিচিতি নেই । আঞ্চলিক পত্রিকায় দুই একটা কবিতা ছাপা হয়েছে । ইশান প্রদেশে বাড়ি । কৃষি হলো প্রধান জীবিকা ইশান বাসীদের ।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো,

লা-সাও এক মেয়েকে ভালোবাসতো কিন্তু কখনো মুখ ফুটে বলেনি । সেই মেয়েটার নাম অনুসা । কবির পাড়াতেই থাকতো অনুসা । এক সাথে সকূলে যাওয়া আর সন্ধ্যে হলে বিলের পাড়ে বসা থাকা, এ ছিলো ওদের নিত্য দিনের কাজ । তারপর ওরা বড় হলো, কলেজে ঢুকলো । অনুসারা খুব গরিব ছিলো তাই অনুসাকে বিয়ে দিয়ে দেয় ওর বাবা, এই বলে শিমলা চুপ হয়ে গেলো ।

আমি বললাম, তারপর কি হলো ?

দাঁড়াও, এয়ারকনটা কমিয়ে আসি । তোমার মনে হয় শীত করছে, থেকে থেকে কেঁপে উঠছে ।

আমি হেসে বললাম, তাহলে তো খুব ভালো হয় কিন্তু তোমার তো অসুবিধে হলো না ?

শিমলা অল্প করে হাসলো । বললো, মেয়েদের অত কিছু ধরতে নেই । তোমরা ভালো থাকলেই আমরা খুশি ।

আমি কিছু বললাম না ।

এয়ারকুলার কমিয়ে এসে বসলো শিমলা । বলতে লাগলো,

অনুসার বিয়ে হলে গেলো । অনুসাকে নিজের কথা বলতে পাড়লো না লা-সাও । দারিদ্রতা এসে বার বার বাধা দিলো লা-সাও কে । স্কুল পড়ুয়া ভাই বোনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো কবি । এভাবে বিশ বছর কেটে গেলো । অনুসার কথা ভেবে লা-সাও আর বিয়ে করেনি । একা একাই জীবন কাটাতে লাগলো । একদিন খোঁজ এলো অনুসার দুরারোগ্য অসুখ হয়েছে, সপ্তাহ খানেকের বেশি বাঁচবে না । লা-সাও আর দেরি করলো না । অনুসাকে দেখতে রওনা হলো । ঠিক করলো ওকে সব খুলে বলবে, এখন তো মরেই যাবে । অনুসার বাড়িতে পৌঁছালো লা-সাও । গিয়ে দেখলো অনুসা

শুকিয়ে কাঠ । মাথার চুল আলুথালু । পরলোকের ছায়া পড়েছে অনুসার চোখে-মুখে । ছেলে বেলার বন্ধু
লা-সাও কে পেয়ে অনুসা খুশি হলো ।

লা-সাও বললো, তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি ?

অনুসা হেসে বললো, বলো ।

লা-সাও বলতে গিয়ে থেমে গেলো । গলা আটকে এলো ওর তারপর অনুসার হাতে একটা চিঠি বাড়িয়ে
দিলো । বললো, এই চিঠিতে আমার কথা বলা আছে । তুমি পড়ে নিও, এই বলে লা-সাও বাড়ি ফিরে
এলো ।

তুমি জানতে চাও ঐ চিঠিতে কি লেখা ছিলো ?

নিশ্চয় জানতে চাই, আমি তাড়া দিয়ে বললাম ।

প্রিয় অনুসা,

আজ বিশ বছর ধরে তোমাকে যে কথা বলতে চেয়েছি, তা আজ লিখে জানাচ্ছি ।
আমি কখনো তোমাকে ভুলতে পারি নি । সেই ছেলেবেলায় তুমি যেমন ছিলে,
আজও তেমনি আছ । দুঃখ একটাই আর তা হলো এই খবরটা বিশ বছর পরে
দিতে হচ্ছে । এটাই নিয়তি । ভালো থেকে । ইতি লা-সাও ।

চিঠিটা বলে শিমলা চুপ হয়ে গেলো । কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে মেয়েটা ।

আমি বললাম, তারপর কি হলো ?

তারপর ? তারপর লা-সাও বাড়ি ফিরে এলো । কিছুদিন যেতেই ডাক যোগে একটা চিঠি
পেলো লা-সাও । চিঠিটা খুলে দেখলো অনুসার চিঠি । বড় বড় হরফে লিখেছে ।

প্রিয় লা-সাও,

আমাকে কেনো আগে বলো নি ? তোমার মতন আমিও যে একি কথা বিশ বছর
ধরে লালন করে ফিরছি কিন্তু আফসোস জীবনের পড়ন্ত বেলায় আমাকে শুনতে হলো
। এখন খুব বাঁচতে ইচ্ছে করছে । কেন বললে না তুমি ? তোমার অনুসা ।

এই চিঠিটা পড়ে লা-সাও আবার রওনা হলো অনুসার বাড়িতে । গিয়ে দেখলো বাসায় কেউ নেই ।

পাশের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লো লা-সাও । এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এলো ।

সালাম দিয়ে লা-সাও বললো, অনুসাদের বাড়িতে কাউকে দেখছি না ?

ওরা cemetery তে গেছে ।

কেনো ?

আজ সকালেই অনুসা মারা গেলো । ওকে নিয়ে ওরা cemetery তে গেছে । তুমি হয়তো গেলে
পাবে ।

লা-সাও কিছু বললো না । ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলো । হাঁটা দিলো বাড়ির দিকে, ইশান প্রদেশে ।

গল্পটা শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ হলো কিন্তু তার রেশ এখনো ছড়িয়ে আছে । দুজনেই চুপ হয়ে বসে
আছি, সারা ঘরে নেমে এলো নিস্তরতা ।

আমি বললাম, লা-সাও কি এখনো বেঁচে আছে ?

আছে তবে বুড়িয়ে গেছে । ইশান প্রদেশে গেলে দেখতে পাবে ।

আমি বললাম, এখনো কবিতা লেখে ?

হ্যাঁ লেখে, ওর কবিতা পড়লে তুমি চোখের পানি রাখতে পারবে না ।

আমি কিছু বললাম না, চুপ হয়ে গেলাম । খেয়াল করে দেখলাম আমার চোখের কোণ ভিজ়ে উঠেছে ।

একটু পরে সোফা ছেড়ে উঠে গেলো শিমলা । বললো, একটু বসো । এখনি আসছি ।

শিমলা উঠে গিয়ে একটা ফোন করলো । থাই ভাষায় কি যেন বললো । তারপর ফিরে এসে বললো,

আবার কুড়ি বছর পরে তার সাথে দেখা হয় যদি

আবার বছর কুড়ি পরে-

হয়তো ধানের ছড়ার পাশে

কার্তিকের মাসে

জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার,

তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার ।

আমি বললাম, জীবনানন্দের কবিতা বললে ?

হু। দেখেছো জীবনানন্দের সাথে লা সাওয়ের জীবন কেমন মিলে গেছে ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম, কিছু বললাম না।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে শিমলা বললো,

আমাদের এই তিন মাস ভাল কাটলো সাইদ। তুমি চলে গেলে জীবনানন্দকে নিয়ে কথা বলার সংগী হারিয়ে ফেলবো। তুমি ছিলে, অনেক কথা জানা গেছে। আমিও অনেক কথা বলেছি। তোমাকে এত কথা কেন বললাম সেটাই ভাবছি।

আমি বললাম, দেখো, আবার আসবো।

শিমলা হাসলো, কিছু বললো না।

আবারও সুবর্ণভূমি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট

সকাল তিনটায় প্লেন ছেড়ে যাবে। তার মানে আজ রাত তিনটে। পুরো ব্যাংকক জুড়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যেদিন থাইল্যান্ডে আসি, সেদিন এমনি ঝর ঝরে বৃষ্টি ঝরছিলো।

দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেল। এখন ফিরবার পালা। তেমন কিছু কিনিনি। শিমলার উপহার দেয়া এক সেট সাট আর ধূসর রঙের টাই যোগ হয়েছে আমার লাট বহরে। এর সাথে কিছু গিফট। অবশ্য নূতন একটা স্যুটকেস কিনেছি হাজার বাথ দিয়ে। বেশ সুন্দর, চারিদিকটা ধূসর। হাতলটা কালো রঙের। দূর থেকে মনে হয় একটা মাটির ডিবি উঁচু হয়ে আছে।

মালয়শিয়াতে আমার বাড়ির আশেপাশে অনেক ছেলেপুলে থাকে। অবসর দিনগুলোতে ওদের নিয়ে কাটাই। মাঝেসাঝে ওদের ডেকে কার্টুন আর কমিকস দেখি। খুব খুশি হয় ওরা। ওদের জন্য চকলেট কিনতে নিয়ে কিনলাম না। ভাবলাম ওদের বাবা মার কাছে Permission নিয়ে চকলেট কিনে দেবো।

রাত একটায় রিপোর্টিং। ঠিক ঠিক প্লেন উড়লে দুই ঘন্টায় কুয়ালালুমপুর পৌঁছানো যাবে। সুবেহ-সাদিকে প্লেনটা গিয়ে নামবে কুয়ালালুমপুর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্টে একাই যেতে চেয়েছিলাম। শিমলা রাজী হলো না, ও পৌঁছে দেবে। রাত বারটায় আসবে শিমলা। সুকুমভিট রোড থেকে এক ঘন্টা লাগবে এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে।

বারোটা বাজতে চলেছে। একটু পরেই শিমলার টেলিফোন পাবো তারপর নিচে নেমে যাবো। ব্যাংকক ছেড়ে যাচ্ছি, ভাবতে মনটা দুলে উঠলো।

সম্পূর্ণ কাকতলীয় ভাবে শিমলার সাথে পরিচয় তারপর ঘুরে বেড়ানো । সুকুমভিট রোড থেকে শুরু করে প্রাতু নাম । রাতের বেলায় রেসতোরায় ডিনার করা তারপর হাঁটতে হাঁটতে পার্কে বসা । আলো আঁধারির বেঞ্চে বসে জীবনানন্দের কবিতা শোনা । হাজারো নক্ষত্রে ভর করে চাও ফ্রেয়া নদীতে ঘুরে বেড়ানো । অহিংস মানব গৌতমের দর্শন নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা । মনে হয় কত বছরের চেনা মেয়েটা ।

ঠিক বারোটায় ফোন বেজে উঠলো । ফোন তুলতেই শিমলার গলা । নেমে আসো সাইদ । আমি হোটেলের বারান্দায় অপেক্ষা করছি ।

গাড়ি ছেড়ে দিলো, নূতন মডেলের টয়োটা । নিঃশব্দে হাইওয়েতে উঠে এলো । এক ঘন্টা লাগবে তারপর ঠিক ঠিক পৌঁছে যাবে সুবর্ণভূমি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে । এই এয়ারপোর্টটা নূতন বানিয়েছে থাইরা । আসিয়ানের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ এয়ারপোর্ট ।

শিমলা আজ ড্রাইভার আনেনি । নিজেই চালিয়ে এসেছে । আজ আর অফিসের ড্রেস পড়েনি । ট্র্যাডিশনাল থাই ড্রেস পড়েছে ও । মাথার চুল শক্ত করে বাধা, কানের লতিতে ঝুলে আছে ডায়মন্ডের রিং । হাইওয়ে রাস্তায় নিয়নের আলো পড়তেই জ্বল জ্বল করে উঠলো রিং দুটো ।

একটু পরে শিমলার হ্যান্ডফোন ফোন বেজে উঠলো । শিমলা কথা বলছে থাই ভাষায় । আমার দিকে তাকিয়ে বললো,

মা কথা বলবে তোমার সাথে ।

আমি ফোনটা তুলে নিলাম ।

ওপার থেকে মেয়েলি কণ্ঠ ভেসে এলো, সাইদ, আবার এসো । আমরা তোমাকে মিস করবো ।

আমি বললাম, নিশ্চয় । আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন ।

কোন উত্তর এলো না । বুঝলাম উনি প্রার্থনা করছেন ।

কিছুক্ষণ পরে বললো, হ্যাঁ । আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি ।

ধন্যবাদ ।

ভালো থাকো, শুভ রাত্রি । Safe Journey ।

হাইওয়ে মাড়িয়ে গাড়িটা ছুটে চলেছে । দুই ধারে রাস্তা, ঘাট, দোকান ত্বরিত সরে যাচ্ছে । মাঝে মধ্যে
বৃষ্টির ঝাপটা এসে পড়ছে গাড়ির উইন্ডশিলে । কেমন শীত শীত করতে লাগলো আমার ।

শিমলা বললো, কদিন থেকে গেলে হতো না সাইদ ?

আমি বললাম,

সামনের সপ্তাহে সুইজারল্যান্ড যাচ্ছি । এখন না গেলে গুছিয়ে উঠতে পারবো না ।

শিমলা বললো,

ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে পাতেশা বিচ দেখতে যাবো । ব্যাংকক থেকে ঘন্টা খানেক লাগে ।
দিনে গিয়ে দিনে ফিরবো । তোমার প্রিয় সমুদ্র তোমাকে দেখিয়ে আনতাম ।

এর পরের বার হবে শিমলা । আমি তো আবার আসছি ।

তুমি কি আর কখনো আসবে ?

আমি চুপ হয়ে গেলাম, কিছু বললাম না । মিথ্যা কোন Promise করতে ভয় হলো কারণ সামনের
সপ্তাহে সুইজারল্যান্ড যাচ্ছি দুই বছরের জন্য ।

তুমি না হয় সুইজারল্যান্ডে ঘুরে যাও । তখন তুমি আমার মেহমান ।

আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো শিমলা । কিছু বলতে নিয়ে থেমে গেলো ।

দেখতে দেখতে এয়ারপোর্ট চলে এসেছে । মালপত্র গুছিয়ে নেমে এলাম । সোজা কাউন্টার বরাবর হাঁটা
দিয়েছি । কাউন্টারে এসে দেখলাম সব ঠিক আছে । প্লেন ঠিক সময়ে উড়ে যাবে ।

কাউন্টারে একটা মেয়ে বসে আছে । থাই মেয়ে, লাল রংয়ের ইউনিফরম, আমাকে দেখে বললো,
তোমার পাসপোর্ট আর টিকেট গুলো দাও ।

আমি বের করে দিলাম ।

মেয়েটা অনেকক্ষণ কম্পিউটারে টেপাটেপি করে বললো,

এই নাও তোমার বোর্ডিং কার্ড । ঠিক তিনটায় প্লেন ছেড়ে যাবে । ঐ ডান দিকে
ইমিগ্রেশন । ইমিগ্রেশন করে সোজা চলে যাবে । একটু হাঁটলেই দেখবে সি-টু গেট, ওখানে আমাদের
এয়ারক্র্যাফট দাঁড়িয়ে আছে । আর কিছু জানতে চাও ?

আমি বললাম, না ।

মেয়েটা হেসে বললো, তোমাকে ধন্যবাদ আমাদের সেবা নেবার জন্য ।

তোমাকেও ধন্যবাদ ।

মেয়েটা হেসে দিলো, মিষ্টি হাসি ।

কাউন্টার থেকে বেরিয়ে দেখি শিমলা এক কোণায় বসে আছে । আমি কাছে যেতেই উঠে দাঁড়ালো ।

আমি বললাম, প্লেন ঠিক সময়ে ছেড়ে যাবে । আমাকে ওরা ইমিগ্রেশনে যেতে বলছে ।

শিমলা কিছু বললো না, চুপ করে রইলো ।

আমি বললাম,

তুমি আর এই হিমের মধ্যে থেকে না । রাত অনেক হলো তার উপর সকালে তোমার অফিস । তুমি বরন্স চলে যাও ।

না । আরো একটু থাকি সাইদ ।

আমি বললাম,

আমি তো এখনি ভেতরে ঢুকে পড়বো আর বেরুতে পারবো না । তুমি এই হিমের মধ্যে নাই বা বসলে ।

শিমলা মাথা নেড়ে সায় দিলো । তুলে নিলো হাতের ব্যাগটা ।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে শিমলার গাড়ির কাছে এলাম । আমি গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি ।

শিমলা বললো, আবার এসো সাইদ ।

আমি হেসে দিলাম । তাকিয়ে দেখলাম শিমলার চোখে কয়েক বিন্দু পানি জমে আছে । বীপরিত দিক থেকে আসা গাড়ির হেডলাইট পড়তেই সে গুলো জ্বল জ্বল করে উঠলো ।

শিমলা গাড়ি ছেড়ে দিলো । আস্তে আস্তে পেছনের লাল বাতি ছোট হয়ে এলো, এক সময় মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে ।

আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম স্থির হয়ে তারপর হাঁটা দিলাম ইমিগ্রেশনের দিকে । যন্ত্র চালিতো সিড়িতে চড়ে বসেছি । মনে এসে ভর করলো শিমলার কথা, এক ভিনদেশী মেয়ের কথা যার সারা অন্তর জুড়ে বাংলাদেশের এক কবি ছায়া ফেলে রেখেছে । যার অস্থি মজ্জায় গৌতম বুদ্ধের অহিংস নীতি নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে । । ধর্ম, বর্ণ জাতি সকল কিছুর উর্ধ্বে উঠে যে কিনা মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছে । সে হলো এ দেশেরই এক মেয়ে, শিমলা । শিমলা আচার্য ।

ইমিগ্রেশনের কাছে এসে থমকে দাড়ালাম । কি জানি মনে হলো আর ভেতরে ঢুকলাম না । সোজা চলে এলাম এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে । বললাম, একটা জরুরি কাজে হঠাৎ আটকে গেছি । আমি যেতে পারছি না । এখন কি করবো বলো ?

মেয়েটা হেসে বললো,

তোমার লাগেজ এয়ারক্র্যাফটে চলে গেছে । এখন আর ফিরিয়ে আনা যাবে না । তবে তুমি যখন মালয়শিয়ায় যাবে, তখন আমাদের অফিস থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে । এই বলে মেয়েটা কি যেন আলাপ করলো পাশের এক লোকের সাথে তারপর বললো,

আধা ঘন্টার মতন অপেক্ষা করো । আমি কুপন বানিয়ে দিচ্ছি, এই বলে মেয়েটা চলে গেলো । আমি পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম ।

ঠিক ঠিক আধা ঘন্টা পরে মেয়েটা ফিরে এলো । হেসে বললো, এই নাও তোমার কুপন ।

ধন্যবাদ ।

মেয়েটা হেসে বললো, তোমাকেও ধন্যবাদ । আশা করছি কদিন পর আবার দেখা হবে ।

আমি কুপনটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম । ডিপারচার করিডরে আসতেই শুনলাম পেছন থেকে কে যেনো ডাকছে । ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম শিমলা, শিমলা আচার্য । আমার থেকে চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে ।

আমি বললাম, তুমি যাও নি ?

গিয়েছিলাম । বাড়ির কাছে গিয়ে আবার ফিরে এসেছি ।

কেনো ?

আমার মনে হচ্ছিলো তুমি যাবে না তাই নিতে এলাম ।

আমি হেসে বললাম, কেন গেলাম না তা জানতে চাইবে না ?

না তার দরকার নেই । এসো আমার সাথে ।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির কাছে এলাম । আমার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে গাড়ির পেছনে ভরলো শিমলা ।

উঠে পড়া সাইদ ।

উঠে এলাম গাড়িতে । গাড়ি ছেড়ে দিলো । ধীরে ধীরে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছে গাড়িটা । ।
তাকিয়ে দেখলাম শিমলার চোখে জমে যাওয়া পানি এখনো ঝুলে আছে । নিয়নের আলোতে সেগুলো
জ্বল জ্বল করে উঠলো ।

আমি বললাম, তুমি কাঁদছো কেনো ?

হ্যাঁ কাঁদছি । আমাকে কাঁদতে দাও, বাধা দিও না । আজ আমি প্রাণ খুলে কাঁদবো ।

আমি আর কথা বাড়ালাম না, চুপ হয়ে বসে রইলাম । আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম শিমলা কেঁদে
চলেছে ।

দেখতে দেখতে গাড়িটা হাইওয়ায়েতে উঠে এলো তারপর ছুটে চললো সামনের দিকে । ঘড়িতে তাকিয়ে
দেখলাম রাত দুটো । বৃষ্টি থেমে গেছে কিছুক্ষণ হলো, পরিস্কার হয়ে উঠেছে আকাশ । আকাশে আজ
ভরা পূর্ণিমা, সেই আলোতে থিক থিক করছে চারিপাশ । আমার মনে হলো এই মাত্র বুঝি অহিংস
মানব গৌতমের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হলো আর তার ছটায় আলোয় আলোয় ভরে উঠেছে চারিপাশ ।

শেষ

Please comment about the book at ; sayed.hossain@yahoo.com

Please visit my website: www.sayedhossain.com

Dec 15, 2009